কতিপয় দীনী বিষয় : যা একজন মুসলিমের জানা প্রয়োজন

[Bengali - বাংলা - بنغالي]

মোস্তাফিজুর রহমান ইবন আব্দুল আযীয আল-মাদানী

৪০৩২

সম্পাদনা: ড. মোহাম্মাদ মানজুরে ইলাহী

بعض ما يحتاجه المسلم في معرفة دينه

مستفيض الرحمن بن عبد العزيز المدني

مراجعة: د/ محمد منظور إلهي

সূচীপত্র

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্যে যিনি আমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সফল জীবন যাপনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম।

মূলতঃ কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যানার বানানোর উদ্দেশ্যেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে লিখার জন্য আমি আমার উর্ধতনের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হই। এগুলো যে কোনো মুসলিমের জানা থাকা অবশ্যই কর্তব্য। পরবর্তীতে কিছু শুভানুধ্যায়ী ভাইদের আবেদনক্রমে তা পুস্তিকা রূপে প্রচারের চিন্তা-ভাবনা করি। আশা করি যে কোনো মুসলিম এ থেকে কম-বেশি উপকৃত হতে পারবে। আর তাই হবে আমাদের একান্ত কামনা।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস উল্লেখ হয়েছে সাধ্যমতো এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন ও দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে কমপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আলবানী রহ.-এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনঃর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থান নির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও

সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে ভুল যত সামান্যই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোনো কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোনো জনের যে কোনো ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শাইখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি না, যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তার অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তার জন্য এ কাজটিকে জান্নাতে যাওয়ার উসীলা বানিয়ে দিন। উপরন্তু তার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন -এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

فضل طلب العلم

দীনী জ্ঞান আহরণের বিশেষ কয়েকটি ফযীলত

১. আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানীদের মর্যাদা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ﴾ [المجادلة: ١١]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও জ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন"। [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ১১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٩﴾ [الزمر: ٩]

"আপনি তাদেরকে বলে দিন, যারা জ্ঞানী এবং যারা মূর্খ তারা উভয় কি একই সমান"? [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৯]

২. দীনী জ্ঞানার্জন আল্লাহভীতি অর্জনের এক বিশেষ মাধ্যম:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ﴾ [فاطر: ٢٨]

"আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মাঝে যারা সত্যিকারার্থে জ্ঞানী তারাই মূলতঃ তাঁকে ভয় করে"। [সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮]

৩. দীনী জ্ঞান শেখা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَىٰكُمۡ ١٩﴾ [محمد: ١٩]

“অতএব, তুমি জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্য কোনো মা‘বূদ নেই এবং তুমি ও তোমার মুমিন পুরুষ ও মহিলা উম্মতের সমূহ গুনাহ’র জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

“দীনী জ্ঞান শেখা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয”।[1]

৪. দীনী জ্ঞান মূলতঃ কল্যাণকর এবং আল্লাহ তা‘আলা যখনই যার কল্যাণ করতে চান তখনই তিনি তাকে তা দিয়ে থাকেন:

মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

---

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২২৩।

“আল্লাহ তা‘আলা কারোর কল্যাণ চাইলে তিনি তাকে দীনী প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন”।[2]

৫. দীনী জ্ঞান আহরণের জন্য কোনো পথ পাড়ি দিলে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন:

আবুদারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ»

“কেউ দীনী জ্ঞান শেখার জন্য কোনো পথ অতিক্রম করলে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর ফিরিশতাগণ জ্ঞান পিপাসুদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তারা নিজেদের ডানাগুলো জমিনে বিছিয়ে দেন। উপরন্তু জ্ঞান পিপাসুদের জন্য আকাশ ও জমিনের সকল কিছু এমনকি পানির মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করে। একজন আলিমের মর্যাদা একজন ইবাদতকারীর ওপর তেমন যেমন চন্দ্রের মর্যাদা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর। আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। নবীগণ কখনো কোনো দীনার-দিরহাম তথা টাকা-পয়সা মিরাস হিসেবে রেখে যান না, বরং

---

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৩৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২১৯।

তারা একমাত্র রেখে যান অহীর জ্ঞান। যে তা গ্রহণ করবে সেই পেয়ে যাবে বিশাল অংশ”।[3]

৬. দীনী জ্ঞান আহরণ অভিশপ্ত জীবন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا»

“দুনিয়া অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তাতে যা রয়েছে। তবে আল্লাহর যিকির ও তাঁর আনুগত্য, আলিম এবং দীনী জ্ঞান আহরণকারী”।[4]

৭. দীনী জ্ঞান আহরণ আল্লাহ তা‘আলার পথে জিহাদ সমতুল্য:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ الا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ»

“যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দীনী জ্ঞান শেখা বা শেখানোর জন্য আমার মসজিদে আসলো সে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার পথের একান্ত মুজাহিদ সমতুল্য।

---

[3] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২২২।

[4] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪১৮৭।

আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসলো সে ব্যক্তি অন্যের সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকা লোকের মতো”।[5]

[5] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২২৬।

أركان الإسلام الخمسة بأدلتها

দলীলসহ ইসলামের পাঁচটি রুকন

মানব সমাজের সমূহ কল্যাণ একমাত্র সত্য দীন পালনের ওপরই নির্ভরশীল। আর এর প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা এতো বেশি যতটুকু না তাদের প্রয়োজন খাদ্য, পানি ও বায়ুর প্রতি। কারণ, মানুষের কর্মকাণ্ড তো সাধারণত দু' ধরনের। তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে অথবা অকল্যাণ। আর সর্বদা নিরেট কল্যাণ সংগ্রহ করা ও সমূহ অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার শিক্ষাই তো যে কোনো সত্য ধর্ম দিয়ে থাকে। আমাদের ধর্মের আবার তিনটি স্তর রয়েছে। ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। ইসলাম বলতে ধর্মের কিছু প্রকাশ্য মৌলিক কর্মকাণ্ডকেই বুঝানো হয়, যা আমাদের দীনের জন্য পাঁচটি। আর ঈমান ও ইহসান বলতে ধর্মের কিছু অপ্রকাশ্য মৌলিক কর্মকাণ্ডকেই বুঝানো হয়, যা আমাদের দীনের জন্য পর্যায়ক্রমে ছয়টি ও দু'টি। সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলিম ধার্মিকের সংখ্যা বেশি। তারপর মুমিন এবং তারপর মুহসিন। আর বিশেষত্বের দিক দিয়ে সব চাইতে ব্যাপক হচ্ছে মুহসিন। তারপর মুমিন এবং তারপর মুসলিম। কারণ, যে মুহসিন সে অবশ্যই মুমিন ও মুসলিম। আর যে মুমিন সে অবশ্যই মুসলিম। এর বিপরীতে যে কোনো মুসলিম সে মুমিন কিংবা মুহসিন নাও হতে পারে। তেমনিভাবে যে কোনো মুমিন সে মুহসিন নাও হতে পারে।

ইসলাম মানে আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা এবং শির্ক ও মুশরিক, কুফুর ও কাফির থেকে অবমুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার

সামনে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٢٢﴾ [لقمان: ٢٢]

“কেউ যদি সৎ কর্মপরায়ণ হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে তাহলে সে যেন দৃঢ়ভাবে এক মজবুত হাতল হস্তে ধারণ করলো। কারণ, সকল কর্মকাণ্ডের পরিমাণ তো একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই এখতিয়ারে”। [সূরা লোকমান, আয়াত: ২২]

ইসলামের রুকন পাঁচটি:

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ »

“ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বস্তুর ওপর”। সেগুলো হলো:

ক. এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্য কোনো মা‘বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

খ. সালাত কায়েম করা।

গ. যাকাত আদায় করা।

ঘ. হজ করা।

ঙ. রমাযানের সাওম পালন করা”।[6]

উক্ত রুকনগুলো সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. শাহাদাতাইন:

আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপারে এ কথা কায়মনোবাক্যে স্বীকার করা যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্য কোনো মাবূদ নেই। তিনি ছাড়া দুনিয়াতে আর যত ব্যক্তি বা বস্তুর পূজা করা হচ্ছে তা সবই বাতিল। এর আবার দু’টি রুকন রয়েছে যা হলো:

ক. আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত যে আর কেউ নেই এ কথা বিশ্বাস করা। অন্য কথায়, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য যে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ইবাদাতকে অস্বীকার করা।

খ. একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই যে ইবাদতের উপযুক্ত এ কথা মনেপ্রাণে স্বীকার ও বিশ্বাস করা।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যে, তিনি যে কোনো ব্যাপারেই যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে ধারণা করা। তিনি যা আদেশ করেছেন তা যথাসাধ্য পালন করা। তিনি যা করতে নিষেধ করেছে তা হতে একেবারেই বিরত থাকা। একমাত্র তাঁর নির্দেশিত শরী‘আত অনুসারেই আল্লাহ তা‘আলার

---

[6] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬।

ইবাদাত করা।

২. যথাযথভাবে পাঁচ বেলা সালাত নিয়মিত কায়েম করা:

প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ওপরই এ সালাতগুলো পড়া ফরয। নিরাপদ ও আতঙ্কিতাবস্থায়, সুস্থ ও অসুস্থাবস্থায়, নিজ এলাকা ও অন্য যে কোনো জায়গায় তথা সর্বাবস্থায় তা পড়তে হয়। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী সংখ্যা ও ধরনে শরী'আতে কিছু ছাড় রয়েছে। সালাত হচ্ছে নূর, ধর্মের বিশেষ স্তম্ভ, আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে সম্পর্কোন্নয়নের একটি বিশেষ মাধ্যম। সালাতের যেমন একটি বাইরের দিক তথা দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সাজদাহ এমনকি আরো অন্যান্য কথা ও কাজ রয়েছে তেমনিভাবে তার একটি ভিতরের দিক তথা অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহত্ব, মর্যাদা, আনুগত্য, ভয়, ভালোবাসা, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা ইত্যাদিও রয়েছে। এর বাহ্যিক দিকটুকু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সম্পাদন করেছেন সেভাবেই করতে হয়। আর এর অভ্যন্তরীণ দিকটুকু আল্লাহ তা'আলার প্রতি খাঁটি ঈমান, বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও বিনম্রতার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়।

সালাত একজন নিষ্ঠাবান সালাত আদায়কারীকে যে কোনো অপকর্ম থেকে দূরে রাখে এবং তার সকল পাপ মোচনের একটি বিশেষ কারণ হয়।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا»

"তোমাদের কি মনে হয়, যদি তোমাদের কারোর ঘরের দরজার পার্শ্বে একটি নদী থাকে আর সে তাতে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে তা হলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। তার শরীরে সত্যিই কোনো ময়লা থাকবে না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তেমনিভাবে কেউ দৈনিক পাঁচ বেলা সালাত পড়লে আল্লাহ তা'আলা তার সকল গুনাহ মুছে দিবেন"।[7]

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতেরই হিসাব হবে। যে ব্যক্তি নিজের ওপর দৈনিক পাঁচ বেলা সালাত ফরয হওয়া তথা এর বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করলো সে তো অবশ্যই কাফির। এতে কোনো আলিমের কোনো ধরনের দ্বিমত নেই। তবে কেউ অলসতা করে সালাত পড়া ছেড়ে দিলে সে এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে না জেনে থাকলে তাকে তা জানানো হবে আর জেনে থাকলে তাকে তিন দিন তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে তাওবা না করলে তার উপর মুরতাদ হিসেবে (সরকারী আদেশে) ফৌজদারী দন্ডবিধি কার্যকর করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ﴾ [التوبة: ١١]

---

[7] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬৭।

“অতএব, তারা যদি তাওবা করে নেয় এবং সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদেরই মুসলিম ভাই”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১]

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاَةِ»

“কোনো ব্যক্তি এবং কুফর ও শির্কের মাঝে ব্যবধান শুধু সালাত না পড়ারই। যে সালাত ছেড়ে দিলো সে কাফির হয়ে গেলো”। [8]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

“যে নিজ ধর্ম পরিবর্তন করলো তাকে তোমরা হত্যা করো”।[9]

৩. সক্ষম হলে যাকাত দেওয়া:

সম্পদ তখনই কারোর ফায়েদায় আসবে যখন তাতে তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে। সেগুলো হলো:

ক. সম্পদগুলো হালাল হওয়া।

---

[8] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮২।

[9] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০১৭।

খ. সম্পদগুলো আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য থেকে বিমুখ না করা।

গ. তা থেকে আল্লাহর অধিকার আদায় করা।

যাকাতের শাব্দিক অর্থ: প্রবৃদ্ধি, বেশি ও অতিরিক্ত। আর যাকাত বলতে বিশেষ কিছু সম্পদের নির্দিষ্ট একটি বাধ্যতামূলক অংশকে বুঝায় যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু সংখ্যক বিশেষ লোকদেরকে অবশ্যই দিতে হয়।

যাকাত মূলতঃ মক্কায় ফরয করা হয়েছে, তবে এর নিসাব (যতটুকু সম্পদ হলে যাকাত দিতে হয়), যে যে সম্পদে যাকাত দিতে হয়, যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র ইত্যাদি দ্বিতীয় হিজরী সনে নির্ধারিত হয়। যাকাত ইসলামের তৃতীয় একটি বিশেষ রুকন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣]

"(হে নবী!) তুমি ওদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা তথা যাকাত গ্রহণ করো। যা তাদেরকে পাক ও পবিত্র করবে। উপরন্তু তাদের জন্য দো'আ করো। নিশ্চয় তোমার দো'আ তাদের জন্য শান্তির কারণ হবে। আর আল্লাহ তা'আলা তো সত্যিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]

যাকাতে বাহ্যত সম্পদ কমলেও বস্তুতঃ তাতে বরকত হয় ও পরিমাণে তা অনেক গুণ বেড়ে যায়। উপরন্তু যাকাত আদায়কারীর ঈমান উত্তরোত্তর বেড়ে যায় এবং তার মধ্যে ধীরে ধীরে দানের অভ্যাস গড়ে উঠে। তেমনিভাবে যাকাত আদায়ে গুনাহ মাফ হয় এবং তা জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম। উপরন্তু যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায়কারীর অন্তর কার্পণ্য ও দুনিয়ার অদম্য লোভ-লালসা থেকে মুক্ত হয়। গরীবদের সাথে ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সম্পদ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে যে বস্তুতে যাকাত আসে: স্বর্ণ-রূপা, টাকা-পয়সা, গরু, ছাগল, উট, জমিনে উৎপন্ন ফসলাদি ও শস্য যা মাপা ও ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করা যায় এবং ব্যবসায়ী পণ্য।

স্বর্ণ ৮৫ গ্রাম ও রূপা ৫৯৫ গ্রাম হলে এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হলে শতকরা ২.৫% হারে তার যাকাত দিতে হয়। তেমনিভাবে টাকা-পয়সা উপরোক্ত স্বর্ণ কিংবা রূপার কোনো একটির পরিমাণে পৌঁছলে শতকরা ২.৫% হারে তারও যাকাত দিতে হয়। তেমনিভাবে গরু, উট কিংবা ছাগল পুরো বছর অথবা বছরের বেশিরভাগ সময় চারণভূমিতে চরে খেলে গরু ত্রিশটি হলে তা থেকে একটি এক বছরের গরু, ছাগল চল্লিশটি হলে তা থেকে একটি ছাগল এবং উট পাঁচটি হলে একটি ছাগল দিতে হয়। অনুরূপভাবে ফসলাদি ও শস্য ৭৫০ কিলো হলে এবং তা বিনা সেচে উৎপন্ন হলে তা থেকে দশ ভাগের এক ভাগ আর সেচ দিতে হলে তা থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ

দিতে হয়। আর যে কোনো ব্যবসায়ী পণ্য স্বর্ণ কিংবা রূপার কোনো একটির পরিমাণে পৌঁছুলে শতকরা ২,৫% হারে তারও যাকাত দিতে হয়।

যারা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত: ফকীর, মিসকীন, যাকাত উসুল ও সংরক্ষণকারী, যাদের অচিরেই মুসলিম হওয়ার আশা করা যায়, কেনা গোলাম যে টাকার বিনিময়ে নিজকে স্বাধীন করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে, ঋণ আদায়ে অক্ষম এমন ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথের যোদ্ধা, দা'ঈ ও সম্বলহারা মুসাফির।

৪. রামাযান মাসে সিয়াম পালন:

অন্তরের বিশুদ্ধতা ও প্রশান্তি নিজ প্রভুর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত। আর বেশি খানাপিনা, বেশি কথা, বেশি ঘুম ও অন্য মানুষের সঙ্গে বেশি মেলামেশা এ পথে বিরাট বাধা। তাই আল্লাহ তা'আলা মাঝে মাঝে বেশি খানাপিনা থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য এ জাতীয় সাওমর ব্যবস্থা করেন। সিয়ামের শাব্দিক অর্থ সংযম, উপবাস ইত্যাদি। আর সাওম বলতে খানাপিনা, সহবাস ও অন্যান্য সাওম ভঙ্গকারী বস্তুসমূহ হতে সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সাওমর নিয়্যাতে ও সাওয়াবের আশায় বিরত থাকাকে বুঝায়। সাওম আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয় এবং তা সাওম পালনকারীর মধ্যে ধীরে ধীরে নিজ কুপ্রবৃত্তি দমন, গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো দায়িত্ব পালন, অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া ও কষ্টের কাজে ধৈর্য ধারণের মতো ভালো ভালো অভ্যাস গড়ে তোলায় বিশেষ সহযোগিতা করে।

সাওম দ্বিতীয় হিজরী সনে ফরয করা হয়। রামযান মাস হচ্ছে মাসগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সাওমর প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ হাতেই দিবেন। কেউ খাঁটি ঈমান নিয়ে একমাত্র সাওয়াবের আশায় পুরো মাস সাওম থাকলে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং সে জান্নাতে "রাইয়ান" নামক গেইট দিয়ে ঢুকার সুযোগ পাবে যা একমাত্র সাওমদারদের জন্যই নির্ধারিত। উপরন্তু রামাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোর একটি রাত শবে ক্বদররূপে সংঘটিত হতে পারে যা হাজার মাস তথা ৮৩ বছর ৪ মাসের চাইতেও উত্তম। উক্ত রাতে কেউ খাঁটি ঈমান নিয়ে একমাত্র সাওয়াবের আশায় নফল সালাত ও দো'আয় ব্যস্ত থাকলে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। তবে সে রাতে নিম্নোক্ত দো'আটি বেশি বেশি বলার চেষ্টা করবে:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু। অন্যকে ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন"।[10]

রামাযানের সাওম মুসলিম, সাবালক, জ্ঞান সম্পন্ন, সাওম রাখতে সক্ষম, নিজ এলাকায় অবস্থানরত এমন প্রতিটি পুরুষ ও মহিলার ওপরই ফরয, তবে মহিলাদেরকে এরই পাশাপাশি ঋতুস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব থেকেও মুক্ত থাকতে হবে।

---

[10] তিরমিযী, হাদীস ৩৫১৩; ইবন মাজাহ, হাদীস ৩৮৫০।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তা ফরয করা হয়েছে পূর্ববর্তীদের ওপর যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩]

কেউ দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃত, সাওমের কথা মনে রেখে, জেনেশুনে যে কোনো খাদ্যপানীয় গ্রহণ করলে, সহবাস করলে, যে কোনোভাবে বীর্যপাত করলে অথবা খাদ্যের কাজ করে এমন কোনো ইঞ্জেকশন গ্রহণ করলে তার সাওম ভেঙ্গে যাবে। তেমনিভাবে মহিলাদের ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর স্রাব হলেও সাওম ভেঙ্গে যায়। অনুরূপভাবে মুরতাদ (দীন ইসলাম ত্যাগকারী) হলেও। উক্ত যে কোনো কারণে সাওম ভেঙ্গে গেলে তার পরিবর্তে আরেকটি সাওম কাযা দিতে হবে। তবে সাওমের দিনে সহবাস করলে কাযা, কাফ্ফারা উভয়টিই দিতে হবে। উপরন্তু সে মহাপাপীরূপেও বিবেচিত হবে। আর কাফ্ফারা হচ্ছে একটি কেনা গোলাম স্বাধীন করা। তা সম্ভবপর না হলে দু’ মাস লাগাতার সাওম রাখা। আর তাও সম্ভবপর না হলে ষাট জন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। তাও সম্ভবপর না হলে আর কিছুই দিতে হবে না।

৫. সক্ষম হলে হজ করা:

হজ হচ্ছে মুসলিম ঐক্য ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক বিশেষ নিদর্শন। হজ

ধৈর্য শেখারও এক বিশেষ ক্ষেত্র। তেমনিভাবে হজ বেশি বেশি সাওয়াব কামানো এবং নিজের সকল গুনাহ আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে মাফ করানো এমনকি তা জান্নাত পাওয়ারও একটি বিশেষ মাধ্যম। উপরন্তু হজের মাধ্যমে বিশ্বের সকল ধনী মুসলিমগণ একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়ে তাদের সার্বিক অবস্থা জানতে পারেন।

হজ ইসলামের একটি বিশেষ রুকন। যা নবম হিজরী সনে ফরয করা হয়। অতএব, তা মুসলিম, সাবালক, স্বাধীন, জ্ঞান সম্পন্ন, হজ করতে সক্ষম এমন প্রতিটি পুরুষ ও মহিলার ওপরই ফরয, যা দ্রুত জীবনে একবারই করতে হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ٩٧﴾ [ال عمران: ٩٧]

“আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ করা সে সকল লোকের ওপর অবশ্যই কর্তব্য, যারা শারীরিক ও আর্থিকভাবে সেখানে পৌঁছুতে সক্ষম। কেউ তা করতে অস্বীকার করলে তার এ কথা অবশ্যই জানা উচিৎ যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি অমুখাপেক্ষী”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯]

মহিলাদের হজের সক্ষমতার মধ্যে তাদের সাথে নিজ স্বামী কিংবা অন্য যে কোনো মাহরাম (যে পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উক্ত মহিলার জন্য হারাম) থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

কোনো মহিলা হজ কিংবা উমরাকালীন সময়ে ঋতুবতী অথবা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবে উপনীত হলে গোসল করে হজ কিংবা উমরাহ’র ইহরাম করবে এবং এমতাবস্থায় সে তাওয়াফ ছাড়া হজের অন্যান্য কাজ করবে অতঃপর পবিত্র হলে গোসল করে হজের বাকি কাজগুলো সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাবে। আর উমরাহ’র সময় ইহরাম অবস্থায় থাকবে এবং পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে উমরাহ’র কাজগুলো সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাবে।

হজ বা উমরাহ করে নফল উমরাহ’র নিয়্যাতে মক্কা থেকে বের হবে না, বরং সে ইচ্ছে করলে হারাম এলাকায় থেকে বার বার নফল তাওয়াফ করবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্যই তান‘ঈমে গিয়ে উমরাহ করার অনুমতি দিলেন কারণ, তিনি ঋতুবতী হওয়ার দরুন হজের উমরাহ করতে পারেন নি।

বাচ্চা যদি বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তা হলে সে সাবালক হওয়ার পূর্বেই নফল হজের ইহরাম করে তা সম্পন্ন করতে পারে। তেমনিভাবে কোনো অভিভাবক তার ছোট বাচ্চার পক্ষ থেকেও নিজ ইহরামের পাশাপাশি তার জন্যও ইহরামের নিয়্যাত করে তাকে সাথে নিয়ে হজ বা উমরাহ’র কাজগুলো যা সে বাচ্চা আংশিক বা পুরোপুরি করতে পারছে না তা সম্পন্ন করবে এবং সে অভিভাবকই তার সাওয়াব পাবে, তবে নাবালক ছেলের কোনো হজ ও উমরাহ ফরয হিসেবে ধর্তব্য হবে না। সাবালক হওয়ার পর তাকে তা আবারো ফরয হিসেবে করতে হবে।

হারাম এলাকায় যেমন সালাতের সাওয়াব বাড়িয়ে দেওয়া হয়

তেমনিভাবে তাতে গুনাহ'র ভয়ানকতাও বেড়ে যায়। তাতে কোনো মুশরিক বা কাফির ঢুকতে পারে না। তাতে যুদ্ধ শুরু করা ও "ইযখির" ছাড়া অন্য কোনো উদ্ভিদ ও গাছপালা কাটা হারাম। কারোর কোনো হারানো জিনিস প্রচারের নিয়্যাত ছাড়া রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া হারাম। উপরন্তু তাতে কোনো প্রাণীকে শিকারের জন্য ধাওয়া করা ও তাকে হত্যা করা হারাম।

হজ ও উমরাহ, সালাত ও ইসলামের অন্যান্য রুকনগুলো বিস্তারিত বিশুদ্ধ বইপত্র কিংবা বিজ্ঞ আলিম থেকে জেনে নিবেন। এ স্বল্প পরিসরে তা বিস্তারিত উল্লেখ করা যাচ্ছে না।

أركان الإيمان الستة بأدلتها

প্রমাণসহ ঈমানের ছয়টি রুকন

শরী‘আতের ভাষায় ঈমান বলতে ছয়টি জিনিসের ওপর ঈমান আনাকে বুঝায়। যেগুলো হলো: আল্লাহ তা‘আলা, ফিরিশতাগণ, রাসূলগণ, রাসূলগণের ওপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ, পরকাল, তাকদীরের ভালো-মন্দ। জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

“ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল ও ভাগ্যের ভালোমন্দের ওপর ঈমান আনা”।[11]

ঈমান বলতে তা মূলতঃ কথা ও কাজের সমন্বয়কেই বুঝায়। মুখ ও অন্তরের কথা এবং মুখ, অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ। ঈমান হচ্ছে একজন মুসলিমের সর্বোত্তম আমল। ঈমান আবার ইবাদতে বাড়ে ও গুনাহে কমে। এর সত্তরেরও বেশি শাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চ শাখা হলো আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্য কোনো মা‘বূদ নেই এ কথা স্বীকার করা। আর এর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে যে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। উপরন্তু লজ্জা হলো এগুলোর মধ্যে অন্যতম।

---

[11] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮।

ঈমানের এক ধরনের স্বাদ রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলাকে রব, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে একান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত। আবার ঈমানের এক ধরনের মিষ্টতাও রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা, কাউকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য ভালোবাসা এবং ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় ঘৃণা করার মধ্যেই নিহিত। আর খাঁটি ঈমানদার তখনই হওয়া যায় যখন কেউ ইসলাম প্রদর্শিত ইবাদাতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে, ইসলামের আদর্শ নিজেদের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়নের জন্য সর্বদা অন্যান্যদেরকে আহ্বান করে, প্রয়োজনে নিজের ঈমান ও ইসলাম টেকানোর জন্য নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় হিজরত করে, অন্য কেউ হিজরত করলে তাকে যথাসাধ্য সার্বিক সহযোগিতা করে, সর্বদা ইসলামের জন্য নিজের জান ও মাল কোরবানী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং এ কথা বিশ্বাস করে যে, যা কিছু আমার নিজের ব্যাপারে কিংবা অন্যের ব্যাপারে ঘটেছে তা না ঘটে পারতো না আর যা কিছু ঘটে নি তা কখনোই ঘটা সম্ভব ছিলো না। আর কারোর ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যই কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসে বা ঘৃণা করে এবং কাউকে কোনো কিছু দেয় বা দিতে চায় না।

আবার ঈমানের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যও রয়েছে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো সেগুলোর অন্যতম:

আল্লাহর রাসূলকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা, আনসারী সাহাবীগণকে ভালোবাসা, সকল মুমিনকে ভালোবাসা, নিজের প্রতিবেশী ও যে কোনো মুসলিমের জন্য তাই ভালোবাসা যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে, প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করা, বলার জন্য কোনো ভালো কথা না পেলে একদম চুপ করে থাকা, সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব ও রাসূল এবং মুসলিম প্রশাসক ও সাধারণ মুসলিমদের সর্বদা কল্যাণ কামনা করা।

নিম্নে ঈমানের উপরোক্ত ছয়টি রুকনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হলো:

১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান। তাতে আবার চারটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত।

ক. আল্লাহ তা'আলার মহান অস্তিত্বের প্রতি ঈমান। তা কিন্তু প্রতিটি মানুষের প্রকৃতির ভেতরেই নিহিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ﴾ [الروم: ٣٠]

"তুমি একনিষ্ঠভাবে দীনমুখী হয়ে যাও। আল্লাহর সে প্রকৃতির অনুসরণ করো যে প্রকৃতির ওপর তিনি পুরো মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই"। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩০]

খ. তাঁর রুবূবিয়্যাতের প্রতি ঈমান। তথা তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক

ও হুকুমদাতা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الاعراف: ٥٤]

“জেনে রাখো, সকল কিছুর স্রষ্টা তিনি। তাই বিধানও হবে তাঁর। সর্ব জগতের রব আল্লাহ সত্যিই বরকতময়”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]

গ. আল্লাহ তা‘আলার উলূহিয়্যাতের ওপর ঈমান। তথা তিনিই সত্য মাবূদ। তাঁর কোনো শরীক নেই। সকল ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য। যা তাঁর প্রতি পূর্ণ সম্মান, ভালোবাসা ও ভক্তি দেখিয়ে একমাত্র তাঁর দেওয়া বিধান অনুযায়ীই করতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣﴾ [البقرة: ١٦٣]

“তোমাদের মা‘বূদ একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। তিনি ছাড়া সত্য কোনো মা‘বূদ নেই। তিনি পরম করুণাময় অত্যন্ত দয়ালু”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৩]

ঘ. আল্লাহ তা‘আলার সকল নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান। তথা তা জানা, বুঝা, মুখস্থ ও স্বীকার করা এবং সেগুলোর মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করা ও সেগুলোর চাহিদানুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝١٨٠﴾ [الاعراف: ١٨٠]

“আল্লাহ তা‘আলার সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো নাম রয়েছে। অতএব, তোমরা তাঁকে উক্ত নামগুলোর মাধ্যমেই ডাকবে। যারা তাঁর নামগুলোর ব্যাপারে সত্য পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ করো। তাদেরকে অতি সত্বর তাদের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই দেওয়া হবে”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০]

ধর্মের মূলই তো হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী, তাঁরসমূহ কর্ম, অপরিসীম ভান্ডার, ওয়াদা ও হুমকির ওপর পূর্ণ ইয়াকীন ও দৃঢ় বিশ্বাস করা। মানুষের সমূহ কর্ম ও ইবাদত উক্ত ভিত্তির ওপরই নির্ভরশীল। এ ঈমানটুকু দুর্বল হলে আমলও দুর্বল হয়। আর তা সবল হলে আমলও সবল হয়।

আল্লাহ তা‘আলা ছোট ও বড়ো, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছুরই মালিক ও স্রষ্টা। সব কিছুর সার্বিক কর্মক্ষমতা ও সমূহ বৈশিষ্ট্য তাঁরই সৃষ্টি। সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে। তিনিই বিশ্বের সব কিছু পরিচালনা করেন। সব কিছুর মূল ভাণ্ডার একমাত্র তাঁরই হাতে। এ কথাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্বাস করলে তাতে একজন ঈমানদারের ঈমান অবশ্যই বেড়ে যাবে, শক্তিশালী হবে। তেমনিভাবে এ কথাগুলোও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, সকল অবস্থা ও পরিস্থিতির মালিক, নিয়ন্ত্রক ও স্রষ্টা তিনি এবং এসবগুলোর ভান্ডারও একমাত্র তাঁরই হাতে।

২. ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান:

ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান আনা বলতে তাদের ব্যাপারে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো ফিরিশতা রয়েছে। তাদের মধ্যে যাদের নাম, বৈশিষ্ট্য ও কর্মসমূহ আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি তাদের ওপর আমরা সেভাবেই ঈমান আনবো। আর যাদের নাম, বৈশিষ্ট্য ও কর্মসমূহ আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পারিনি তাদের ওপর আমরা সামগ্রিকভাবেই ঈমান আনবো। তারা আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত বান্দা। তারা আমাদের প্রভু বা ইলাহ নন এবং এ জাতীয় কোনো বৈশিষ্ট্যও তাদের মধ্যে নেই। তারা এক বিশেষ নূর থেকে সৃষ্ট এবং তারা আমাদের দৃষ্টির বাইরে। তারা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় ব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলার আদেশের একান্ত আনুগত্য ও তা বাস্তবায়নের পুরো ক্ষমতা দিয়েই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]

"আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা আদেশ করেন তা কখনো তারা অমান্য করেন না, বরং তারা যা করতে আদিষ্ট হোন তারা তাই করেন"। [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬]

তাদের গণনা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউই জানে না। প্রতি দিন বাইতুল মা'মূরে সত্তর হাজার ফিরিশতা সালাত পড়েন যারা তাতে আর

কখনো সালাত পড়ার সুযোগ পাবেন না।

আল্লাহ তা‘আলা ফিরিশতাগণকে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে থাকেন যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

তিনি জিবরীল ‘আলাইহিস সালামকে নবী ও রাসূলগণের নিকট তাঁর অহী পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। মীকাঈল ‘আলাইহিস সালামকে পানি ও উদ্ভিদের দায়িত্ব দিয়েছেন। ইসরাফীল ‘আলাইহিস সালামকে সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। আবার মালিক হলেন জাহান্নামের দায়িত্বে এবং রিযওয়ান হলেন জান্নাতের দায়িত্বে। আর মৃত্যুর ফিরিশতা হলেন যে কোনো প্রাণীর মৃত্যুর দায়িত্বে। আবার কিছু ফিরিশতা রয়েছেন আল্লাহ তা‘আলার আরশ বহন করার দায়িত্বে। তেমনিভাবে আরো কিছু রয়েছেন জান্নাত ও জাহান্নামের কর্ম সমূহে নিয়োজিত। আবার কিছু রয়েছেন আদম সন্তানের অস্তিত্ব ও তার কর্মসমূহ হিফাজতের দায়িত্বে। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছেন আবার মানুষের সঙ্গে সর্বদা নিয়োজিত। আবার কিছু রয়েছেন যারা পর্যায়ক্রমে রাত ও দিনে দুনিয়াতে আসা-যাওয়া করেন। আরো কিছু রয়েছেন যারা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় যিকিরের মজলিস অনুসন্ধান করেন। আবার কিছু রয়েছেন জরায়ুর সন্তানের দায়িত্বে। তারা আল্লাহ তা‘আলার আদেশে যে কোনো সন্তানের রিযিক, আমল, বয়স ও পরকালে তার ভাগ্যবান ও দুর্ভাগা হওয়ার ব্যাপারটি তখনই লিখে রাখেন। তেমনিভাবে আরো কিছু ফিরিশতা রয়েছেন যারা যে কোনো মৃত ব্যক্তিকে কবরে শায়িত হওয়ার পর তার প্রভু, ধর্ম ও নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন,

ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩. আল্লাহ তা'আলার কিতাবসমূহের ওপর ঈমান:

আল্লাহ তা'আলার কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা বলতে সেগুলোর ব্যাপারে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের হিদায়াতের জন্য তাঁর নবী ও রাসূলগণের ওপর অনেকগুলো কিতাব পাঠিয়েছেন। যা সত্যিই তাঁর নিজস্ব কথা এবং যা একান্ত নিরেট সত্য। উক্ত কিতাবগুলোর কিছুর বর্ণনা কুরআন মাজীদে এসেছে। আর বাকিগুলোর নাম ও সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এর মধ্যে "তাওরাত" মূসা 'আলাইহিস সালামের ওপর, "যাবূর" দাউদ 'আলাইহিস সালামের ওপর, "ইঞ্জীল" 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের ওপর এবং "কুরআন" আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল করা হয়েছে। তেমনিভাবে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের ওপর অনেকগুলো সহীফাহও নাযিল করা হয়েছে। উক্ত কিতাবগুলোর সকল সত্য সংবাদ আমরা বিশ্বাস করবো এবং সকল অরহিত বিধান আমরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবো। তবে এ কথা অবশ্যই জানতে হবে যে, স্বভাবতই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে যে তাওরাত ও ইঞ্জীল মানুষের হাতে রয়েছে তা অনেকাংশেই বিকৃত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ

﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ﴾ [المائدة: ٤٨]

“আমি তোমার ওপর সত্য কিতাব নাযিল করেছি। যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতাও প্রমাণ করে। তেমনিভাবে কুরআন উক্ত কিতাবগুলোর সংরক্ষক, সাক্ষী ও বিচারক। অতএব, তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত এ কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করো এবং যে সত্য তুমি পেয়েছো তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির কোনোভাবেই অনুসরণ করো না”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৮]

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ কিতাব যা মহান ও পরিপূর্ণ। তাতে সব কিছুর মৌলিক বিধানগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। যা পুরো বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত ও রহমত। এর ওপর আমরা ঈমান আনবো এবং এর বিধানগুলো আমাদের সার্বিক জীবনে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করবো এবং এর আদবগুলো আমরা গ্রহণ করবো। আল্লাহ তা‘আলা এ ছাড়া অন্য কোনো কিতাবের ওপর আমল করা গ্রহণ করবেন না। তিনি উক্ত কিতাবকে হিফাযত করার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন।

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান:

রাসূলগণের ওপর ঈমান বলতে তাদের ব্যাপারে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে এক আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতের দিকে ডাকতেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করতে তিনি নিষেধ করতেন। তারা সবাই ছিলেন আল্লাহ তা‘আলার সত্য রাসূল। আল্লাহ তা‘আলা তাদের নিকট যে অহী পাঠিয়েছেন তা তারা সকলেই নিজ নিজ

উম্মতের নিকট পুরোপুরিভাবে পৌঁছিয়েছেন। তাদের কারো কারোর নাম কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। যাদের সংখ্যা ২৫ জন। তাদের পাঁচ জন হলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। যারা হলেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ ‘আলাইহিমুস সালাম। আর বাকিদের নাম আল্লাহ তা‘আলাই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]

“নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট এ মর্মে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করো এবং সকল তাগুত (যার অনুসরণ করে মানুষ আল্লাহ তা‘আলার সত্য পথ থেকে দূরে সরে যায়) কে প্রত্যাখ্যান করো”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

সর্ব প্রথম রাসূল হচ্ছেন নূহ ‘আলাইহিস সালাম। তেমনিভাবে সর্বশেষ রাসূল হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকল নবী ও রাসূলগণ মানুষই ছিলেন যাঁদেরকে আল্লাহ তা‘আলা নিজ বান্দার মধ্য থেকে তাদেরকে নবুওয়াত ও রিসালতের জন্য চয়ন করেছেন এবং তাদেরকে মু‘জিযা দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। মানুষের সকল বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। তাদের মধ্যে রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। না তারা কারোর লাভ বা ক্ষতি করতে পারেন। না তারা কোনো কিছুর ভাণ্ডারের মালিক। না তারা কোনো গায়িব জানেন বা জানতেন। শুধু তারা তাই জানতেন যা আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জানিয়েছেন।

নবী ও রাসূলগণের অন্তর ছিলো অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, তাদের মেধা ছিলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ঈমান ছিলো অত্যন্ত খাঁটি, চরিত্র ছিলো অত্যন্ত সুন্দর, ধার্মিকতায় ছিলেন তারা অত্যন্ত পরিপূর্ণ, ইবাদতে ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, শারীরিক শক্তিতে ছিলেন অধিক শক্তিমান, গঠনাকৃতিতে তারা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর। তারা নিজ উম্মতদেরকে যে অহীর বাণী শুনিয়েছেন তাতে তারা ছিলেন সকল ভুলের উর্ধ্বে। তাদের মৃত্যুর পর কেউ তাদের সম্পদের ওয়ারিশ হন না। তাদের চোখ ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না। মৃত্যুর সময় তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোনোটি চয়ন করার এখতিয়ার দেওয়া হয়। যেখানে তারা মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই তাদেরকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর পর তাদের শরীরকে মাটি খেতে পারে না। তারা কবরের জীবনে জীবিত। তাদের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রীগণকে বিবাহ্ করা যায় না।

৫. পরকালের প্রতি ঈমান:

পরকালে বিশ্বাস বলতে কিয়ামতের ছোট-বড়ো আলামত, কবরের ফিতনা, আযাব ও শাস্তি, কিয়ামতের দিন মানুষের পুনরুত্থান, কিয়ামতের মাঠে সবার সম্মিলিত অবস্থান, হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত, নেক ও বদের পাল্লা, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে বুঝায়। ঈমানের আরো অন্যান্য স্তম্ভের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর সর্বদা সত্যের ওপর অটলতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতেরসমূহ কল্যাণ নির্ভরশীল।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيهِۗ﴾ [النساء: ٨٧]

“তিনি আল্লাহ। যিনি ছাড়া সত্য কোনো মা‘বূদ নেই। নিশ্চয় তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮৭]

কবরের আযাব আবার দু’ ধরনের।

ক. যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো বন্ধ হবে না। যা কাফির ও মুনাফিকদেরকে দেওয়া হবে।

খ. যা কোনো এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে। তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত গুনাহগারদেরকে দেওয়া হবে। এদের প্রত্যেককে তার গুনাহ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে। এরপর শাস্তি হালকা করে দেওয়া হবে অথবা গুনাহ মাফের কোনো কারণ তথা সাদাকায়ে জারিয়া, লাভজনক জ্ঞান অথবা নেককার সন্তানের দো‘আ ইত্যাদির কোনোটি পাওয়া গেলে তার শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর কবরের শান্তি শুধু খাঁটি ঈমানদারদের জন্য। তবে একজন মুমিন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া, ইসলামী রাষ্ট্র পাহারা দেওয়া ও পেটের রোগে মারা যাওয়ার দরুন কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে।

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের রূহের অবস্থান:

বারযাখী তথা কবরের জীবনে মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের রূহসমূহের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন হবে। কারো কারোর রূহ তো থাকবে সর্বোচ্চ

মর্যাদায় তথা আ'লা 'ইল্লিয়্যীনে। সেগুলো হচ্ছে নবীগণের রূহ। তাদের মর্যাদাগত অবস্থানও আবার ভিন্ন ভিন্ন হবে।

কারো কারোর রূহ আবার পাখির ছবিতে জান্নাতের গাছে গাছে ঝুলানো থাকবে। সেগুলো হচ্ছে মুমিনদের রূহ। আবার কারো কারোর রূহ তো সবুজ বর্ণের পাখির পেটে থাকবে যেগুলো জান্নাতের সর্ব জায়গায় ইচ্ছা মতো ঘুরে বেড়াবে। সেগুলো হচ্ছে শহীদের রূহ। কারো কারোর রূহ আবার কবরে বন্দী থাকবে। সেগুলো হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎকারীদের রূহ। আবার কারো কারোর রূহ জান্নাতের দরজায় আটকানো থাকবে। সেগুলো হচ্ছে ঋণগ্রস্তদের রূহ। কারো কারোর রূহ আবার জমিনে আটকানো থাকবে। সেগুলো হচ্ছে নিকৃষ্ট রূহ। কাফির, মুনাফিক ও মুশরিকদের রূহ। আবার কারো কারোর রূহ থাকবে আগুনের চুলোয়। সেগুলো হচ্ছে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর রূহ। কারো কারোর রূহ আবার রক্তের নদীতে সাঁতরাবে এবং তাদের মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। সেগুলো হচ্ছে সুদ গ্রহিতার রূহ।

৬. ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি ঈমান:

ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান বলতে সে ব্যাপারে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, দুনিয়াতে ভালো-মন্দ যাই ঘটুক না কেন সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বহু পূর্ব থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন তাই তা ঘটেছে। ভাগ্যের ব্যাপারটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর এক বিরাট রহস্য, যা তাঁর কোনো নিকটতম ফিরিশতা বা রাসূলগণও জানেন না। তাতে আবার চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যা

হলো:

ক. এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছু সামগ্রিকভাবেই জানেন। আল্লাহর সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই তাঁর অজানা নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّۖ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾ [الطلاق: ١٢]

"আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশ ও সাত জমিন। সেগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। যেন তোমরা বুঝতে পারো যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে চূড়ান্ত জ্ঞান রাখেন"। [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ১২]

খ. এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টি, তাদের অবস্থা ও রিযিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٧٠﴾ [الحج: ٧٠]

"তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও জমিনে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তা সবই জানেন এবং সব কিছুই লিখিত রয়েছে কিতাবে তথা লাওহে মাহফূযে। অবশ্যই এ কাজটি আল্লাহ তা'আলার জন্য খুবই সহজ"। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৭০]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»

“আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সকল সৃষ্টির ভাগ্য আকাশ ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিখে রেখেছেন”।[12]

গ. এ কথা বিশবাস করা যে, দুনিয়াতে যা কিছু ঘটছে এর কোনো কিছুই আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা ছাড়া ঘটে নি।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيَفۡعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾ [ابراهيم: ٢٧]

“আল্লাহ তা‘আলা যা চান তাই করেন”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ২৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ﴾ [الانعام: ١١٢]

“আর তোমার রব চাইলে তারা এমন কাজ করতে পারতো না”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১১২]

ঘ. এ কথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ কোনো কিছু সৃষ্টি করেন নি। তিনিই প্রতিপালক।

---

[12] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৩।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ٦٢﴾ [الزمر: ٦٢]

“আল্লাহ তা‘আলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সব কিছুর রক্ষকও”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬২]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ٩٦﴾ [الصافات: ٩٦]

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে এমনকি তোমাদেরসমূহ কর্মকেও সৃষ্টি করেছেন”। [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৯৬]

نواقض الإسلام العشرة

ইসলাম বিধ্বংসী দশটি বিষয়

প্রিয় দীনী ভাইয়েরা! দশটি এমন মারাত্মক কাজ ও বিশ্বাস রয়েছে যার কোনো একটি কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে (ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভয়ে, ঠাট্টাবশত যেভাবেই হোক না কেন) সে ইসলামের গন্ডী থেকে বের হয়ে যাবে এবং নির্ঘাত কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিৎ। সে বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। মৃত ব্যক্তির নিকট কোনো কিছু প্রার্থনা করা, তাদের নিকট কোনো ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করা, তাদের জন্য কোনো পশু জবাই করা অথবা তাদের জন্য কোনো কিছু মানত করা ইত্যাদি শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء: ٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করবেন না তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা তবে তিনি এছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন যার জন্য ইচ্ছে করেন”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾ [المائدة: ٧٢]

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করেন তার ওপর জান্নাতকে করেন হারাম এবং জাহান্নামকে করেন তার শেষ ঠিকানা। আর তখন এরূপ অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৭২]

২. বান্দা ও আল্লাহ তা‘আলার মাঝে এমন কাউকে স্থির করা যাকে বিপদের সময় ডাকা হয়, তার সুপারিশ কামনা করা হয়, তার ওপর কোনো ব্যাপারে ভরসা করা হয়। এমন ব্যক্তি সকল আলিমের ঐক্যমতে কাফির।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾ [يونس: ١٠٦] ﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧﴾ [يونس: ١٠٧]

“আর তুমি আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া এমন কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ডাকো না যা তোমার কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। এমন করলে সত্যিই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন করেন তাহলে তিনিই একমাত্র তোমাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর যদি তিনি তোমার কোনো কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের গতিরোধ করার সাধ্য কারোর নেই। তিনি নিজ বান্দার মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬-১০৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ۝٢٢ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥ ۝٢٣﴾ [سبا: ٢٢، ٢٣]

"আপনি বলুন: তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে পূজ্য মনে করতে তাদেরকে ডাকো। তারা আকাশ ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়। এতদুভয়ে তাদের কোনো অংশীদারিত্বও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। তাঁর নিকট একমাত্র অনুমতিপ্রাপ্তদের পক্ষেই কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হতে পারে"। [সূরা সাবা, আয়াত: ২২-২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ ۝٣﴾ [الزمر: ٣]

"জেনে রেখো, একনিষ্ঠ আনুগত্য শুধু আল্লাহরই জন্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা এদের পূজা-অর্চনা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের কলহপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা দিবেন। প্রত্যেককে যথোচিত প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদী ও কাফিরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না"। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩]

৩. কোনো কাফির ব্যক্তিকে কাফির মনে না করা অথবা সে ব্যক্তি যে সত্যিই কাফির এ ব্যাপারে সন্দেহ করা কিংবা তাদের ধর্ম-বিশ্বাস তথা জীবন ব্যবস্থাকে সঠিক মনে করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ﴾ [الممتحنة: ٤]

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যে মূর্তিসমূহের ইবাদাত করছো তা হতে আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত-পবিত্র। তোমাদেরকে আমরা অস্বীকার করছি এবং আজ থেকে চিরকালের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে বলবৎ থাকবে শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো"। [সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত ৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই বলে স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সকল উপাস্যের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার

জান ও মাল অন্যের ওপর হারাম এবং তার সকল হিসাব-কিতাব একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার হাতে ন্যস্ত”।[13]

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত জীবনাদর্শ ব্যতীত অন্য কোনো জীবনাদর্শকে উত্তম মনে করা অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত বিচারব্যবস্থার চাইতে অন্য বিচারব্যবস্থাকে উন্নত কিংবা সমপর্যায়ের মনে করা। তেমনিভাবে মানবরচিত বিধি-বিধানকে ইসলামী বিধি-বিধানের চাইতে উত্তম মনে করা অথবা এমন মনে করা যে, ইসলামী বিধি-বিধান এ আধুনিক যুগে বাস্তবায়নের উপযুক্ত নয় অথবা ইসলামী সনাতন বিধি-বিধানকে আঁকড়ে ধরার কারণেই আজ মুসলিমদের এই অধঃপতন অথবা ইসলাম হচ্ছে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের জন্য; রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য, দণ্ডবিধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধি-বিধান প্রযোজ্য যেমনিভাবে ইসলামী বিধি-বিধান এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি যে ইসলাম বিধ্বংসী এ ব্যাপারে আলেমদের কোনো মতভেদ নেই।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]

“যারা আল্লাহ অবতারিত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা সম্পূর্ণরূপে কাফির”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: 44]

---

[13] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠﴾ [المائدة: ٥٠]

“তবে কি তারা জাহেলি যুগের বিধান কামনা করে? মুমিনদের জন্য আল্লাহর বিধান চাইতে অন্য কোনো বিধান উত্তম হতে পারে কি”? [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫০]

তিনি আরো বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

“অতএব, আপনার (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিপালকের কসম! তারা কখনো মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আপনাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেয়, এমনকি আপনি যে ফায়সালা করবেন তা দ্বিধাহীন হৃদয়ে গ্রহণ না করে এবং তা হৃষ্টচিত্তে মেনে না নেয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত শর‘ঈ বিধানের কোনো একটির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, যদিও সে তদানুযায়ী আমল করুক না কেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ ٩﴾ [محمد: ٩]

“তা (দুর্ভোগ ও কর্মব্যর্থতা) এজন্যে যে, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অপছন্দ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৯]

৬. ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে বিদ্রূপ করা অথবা উহার কোনো পুণ্য কিংবা শাস্তি-বিধিকে উদ্দেশ্য করে ঠাট্টা করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ ٦٦﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

“হে রাসুল! আপনি বলে দিন: তবে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমুহ এবং তাঁর রাসুলের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছিলে? তোমাদের কোনো কৈফিয়ত গ্রহণ করা হবে না। তোমরা ঈমান আনার পর এখন কাফির হয়ে গিয়েছ”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫-৬৬]

৭. যাদু শেখা কিংবা শেখানো অথবা তাতে বিশ্বাস করা। তেমনিভাবে যে কোনো পন্থায় কারোর মাঝে আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“সুলাইমান ‘আলাইহিস সালাম কুফুরী করেন নি, তবে শয়তানরাই

কুফুরী করেছে, তারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো বাবেল শহরে বিশেষ করে হারূত-মারূত ব্যক্তিদ্বয়কে। (জিবরীল ও মীকাঈল) ফিরিশতাদ্বয়ের ওপর কোনো যাদু অবতীর্ণ করা হয় নি (যা ইয়াহূদীরা ধারণা করতো), তবে ব্যক্তিদ্বয় কাউকে যাদু শিক্ষা দিতো না যতক্ষণ না তারা বলতো: আমরা পরীক্ষাসরূপ মাত্র। অতএব, তোমরা কুফুরী করো না"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০২]

যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, কারো ব্যাপারে তা সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হলে তাকে হত্যা করা। এ ব্যাপারে সাহাবীদের ঐকমত্য রয়েছে।

জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«حَدُّ السَّاْحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»

"যাদুকরের শাস্তি তলোয়ারের কোপ তথা শিরশ্ছেদ"।[১৪]

জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হন নি, বরং তিনি তা বাস্তবে কার্যকরী করেও দেখিয়েছেন।

আবু উসমান নাহদী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ عِنْدَ الْوَلِيْدِ رَجُلٌ يَلْعَبُ، فَذَبَحَ إِنْسَاناً وَأَبَانَ رَأْسَهُ، فَعَجِبْنَا فَأَعَادَ رَأْسَهُ، فَجَاءَ جُنْدُبٌ الْأَزْدِيْ فَقَتَلَهُ»

"ইরাকে ওয়ালীদ ইবন উক্কবার সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি খেলা দেখাচ্ছিলো।

---

14 তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৬০।

সে জনৈক ব্যক্তির মাথা কেটে শরীর থেকে ভিন্ন করে ফেলে। এতে আমরা খুব বিস্মিত হলে লোকটি কর্তিত মাথা খানি যথাস্থানে ফিরিয়ে দেয়। ইতোমধ্যে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তাকে হত্যা করে”।[১৫]

তেমনিভাবে উম্মুল মুমিনীন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার ক্রীতদাসীকেও যাদুকর প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যা করা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«سَحَرَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ جَارِيَةٌ لَهَا، فَأَقَـرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ، فَقَتَلَتْهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَضِبَ، فَأَتَاهُ اِبْنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ فَقَالَ: جَارِيَتُهَا سَحَرَتْهَا، أَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ، قَالَ: فَكَفَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ الرَّاوِيْ: وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ لِقَتْلِهَا إِيَّاهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ»

“হাফসা বিনতে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে তার এক ক্রীতদাসী যাদু করে। এমনকি সে এ ব্যাপারটি স্বীকার করে এবং যাদুর বস্তুটি উঠিয়ে ফেলে দেয়। এতদকারণে হাফসা ক্রীতদাসীকে হত্যা করে। সংবাদটি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে তিনি এ ব্যাপারে চুপ হয়ে যান তথা তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতি না নিয়ে

[15] সহীহ বুখারী/আত্তা’রীখুল্ কাবীর: ২/২২২ বায়হাক্বী : ৮/১৩৬।

ক্রীতদাসীকে হত্যা করার কারণেই তিনি রাগান্বিত হন"।[১৬]

অনুরূপভাবে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার খিলাফতকালে সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করার আদেশ জারি করেন।

বাজালা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنِ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ الرَّاوِيْ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ»

"উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ খেলাফতকালে এ আদেশ জারি করে চিঠি পাঠান যে, তোমরা সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা চারজন মহিলা যাদুকরকে হত্যা করি"।[১৭]

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে উক্ত আদেশের ব্যাপারে কেউ কোনো বিরোধিতা দেখায় নি বিধায় উক্ত ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে বলে প্রমাণ করে।

৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের সহযোগিতা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

16 আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং ১৮৭৪৭; বায়হাক্বী: ৮/১৩৬।

17 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০৪৩; বায়হাকী: ৮/১৩৬; ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নং ২৮৯৮২, ৩২৬৫২; আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং ৯৯৭২; আহমাদ, হাদীস নং ১৬৫৭; আবু ইয়ালা, হাদীস নং ৮৬০, ৮৬১।

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١]

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয় সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫১]

৯. অধিক আমলের দরুন কিংবা অন্য যে কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি শর‘ঈ বিধি-বিধান মানা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে এমন ধারণায় বিশ্বাসী হওয়া।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [ال عمران: ٨٥]

“যে কেউ দীন ইসলাম ব্যতিত অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না এবং পরকালে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫]

১০. ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া (দীনি কোনো কথা শুনেও না তেমনিভাবে আমলও করে না) অর্থাৎ দীনের কোনো ধার ধারে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعۡرَضَ عَنۡهَآۚ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ٢٢﴾ [السجدة: ٢٢]

“যে ব্যক্তিকে তাঁর রবের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো; অথচ

সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিলো তার অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবো”। [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ২২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾

[طه: ١٢٤]

“যে ব্যক্তি আমার কুরআন থেকে বিমুখ হবে তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমরা তাকে উত্থিত করবো অন্ধাবস্থায় কিয়ামত দিবসে”। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأركانها وشروطها

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর অর্থ, রুকন ও শর্তসমূহ

এটি হচ্ছে তাওহীদ, ইখলাস ও তাক্বওয়ার কালেমা এবং এটিই হচ্ছে একজন মুসলিমের জন্য দৃঢ় বাণী। এর জন্যই আকাশ ও জমিন স্থির রয়েছে। এর পরিপূর্ণতার জন্যই সুন্নাত ও ফরযের বিধান রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে এর অর্থ বুঝে এরসমূহ বিষয়ের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এর চাহিদা মতো আমল করে সেই তো খাঁটি মুসলিম; অন্যথা নয়।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর ভাবার্থ: এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর কোনো সত্য মা‘বূদ বা উপাস্য নেই। তথা আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত। ইবাদতে তাঁর কোনো শরীক নেই যেমনিভাবে সৃষ্টিকুলের মালিকানায় তাঁর কোনো শরীক নেই।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর রুকনসমূহ:

এর রুকন হচ্ছে দু’টি। যা নিম্নরূপ:

ক. আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত যে আর কেউ নেই এ কথা বিশ্বাস করা। অন্য কথায়, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য যে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ইবাদাতকে অস্বীকার করা।

খ. একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই যে ইবাদতের উপযুক্ত এ কথা মনেপ্রাণে স্বীকার ও বিশ্বাস করা।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর শর্তসমূহ:

১. কালেমার অর্থ ভালোভাবে জানা ও এ কালেমা কি করতে বলে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং তার ওপর আমল করা। কেউ যদি এ কথা জানে যে, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি এ ব্যাপারে একক। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য যে কারোর ইবাদত বাতিল বলে গণ্য। উপরন্তু সে উক্ত জ্ঞানানুযায়ী আমলও করে তা হলে সে কালেমার অর্থ বুঝেছে বলে দাবি করতে পারে। অন্য কথায়, কেউ কালেমার অর্থ ভালোভাবে জানলে আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কেউ যে ইবাদতের সামান্যটুকুরও অংশীদার হতে পারে এমন কথা ও কাজ সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। অতএব, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কারোর একচ্ছত্র আনুগত্য করা, কাউকে এককভাবে ভয় করা এবং কাউকে সকল আশা ও ভরসার কেন্দ্রবিন্দু মনে করা ইত্যাদি সত্যিই কালেমা বিরোধী ও ঈমান বিধ্বংসের কারণ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]

“তুমি জেনে রাখো যে, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর কোনো সত্য মা‘বূদ বা উপাস্য নেই”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯]

২. উক্ত কালেমার সাক্ষ্য প্রশান্তিময় দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করা। যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই যে ইবাদতের উপযুক্ত এবং তিনি ছাড়া অন্য যে কারোর ইবাদত যে

বাতিল বলে গণ্য উপরন্তু অন্য কারোর জন্য যে ইবাদতের সামান্যটুকুও ব্যয় করা জায়িয নয় এ কথাগুলো সত্য বলে মনেপ্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস করতে হবে। কেউ যদি উক্ত সাক্ষ্যর ব্যাপারে সামান্যটুকুও সন্দেহ পোষণ করে এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত যে বাতিল বলে গণ্য এ ব্যাপারে কোনো ধরনের দ্বিধা-সংশয় বোধ করে তাহলে তার উপরোক্ত সাক্ষ্য অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ ﴾ [الحجرات: ١٥]

"নিশ্চয় সত্যিকার ঈমানদার ওরা যারা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান এনেছে। অতঃপর তাতে কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ করে নি"। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَشْهَدُ أَنْ لَا اله إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে কোনো বান্দা নিঃসন্দেহভাবে সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সে নিশ্চয় জান্নাতে

প্রবেশ করবে"।[18]

৩. উক্ত কালেমা যা ধারণ করা ও করতে বলে তা সম্পূর্ণরূপে কায়মনোবাক্যে মেনে নেওয়া। তথা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার, বিশ্বাস ও গ্রহণ করা। এর কোনো কিছুই পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান না করা। যেমনঃ ইয়াহূদী-খ্রিস্টানের আলিমরা উক্ত কালেমার অর্থ জানতো এবং তা বিশ্বাসও করতো। তবে তারা তা অহঙ্কারবশতঃ গ্রহণ করে নি ও মেনে নেয় নি।

আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤٦﴾ [البقرة: ١٤٦]

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে চিনে যেমন চিনে নিজ পুত্রসন্তানদেরকে। তবে নিশ্চয় তাদের এক দল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করছে"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৬]

যারা শরী'আতের কোনো বিধান কিংবা দণ্ড-বিধি নিয়ে প্রশ্ন তোলে যেমন, চুরি ও ভ্যবিচারের দন্ড অথবা বহু বিবাহের মতো বিধানের ওপর নাক সিটকায় তারা যে উক্ত কালেমার চাওয়া-পাওয়া মনে-প্রাণে মেনে

---

[18] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭।

নিতে পারে নি তা সহজেই বুঝা যায়।

৪. উক্ত কালেমা যা বুঝায় তা সম্পূর্ণরূপে মাথা পেতে নেওয়া। তথা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা কোনো ধরনের কমানো বাড়ানো ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে ও সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নেওয়া এবং কাজে পরিণত করা। উপরন্তু তা নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবতারণা না করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ﴾ [الزمر: ٥٤]

"তোমরা নিজ রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করো"। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

"তোমার রবের শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়, অতঃপর তোমার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নেয়"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

এ শর্ত ও পূর্বের শর্তের মাঝে পার্থক্য এই যে, পূর্বের শর্ত কালেমা যা বুঝায় তা মৌখিকভাবে মেনে নেওয়া আর এ শর্ত হচ্ছে তা কার্যগতভাবে মেনে নেওয়া।

যারা শরী'আতের বিচার বাদ দিয়ে মানব রচিত বিচারের নিকট ধর্ণা দেয় তারা যে উক্ত কালেমার চাওয়া-পাওয়া মাথা পেতে নিতে পারেনি তা সহজেই বুঝা যায়।

৫. উক্ত কালেমা যা বুঝায় তা মনেপ্রাণে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় দেওয়া। এ কালেমার প্রতি অন্যকে দাওয়াত দেওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁর বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে নিজ সর্বশক্তি বিনিয়োগ করা সত্যিকারার্থেই এ ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় বহন করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩﴾ [التوبة: ١١٩]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং (কথায় ও কাজে) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৯]

আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

“যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে বলবে যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্য কোনো মা‘বূদ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।[19]

আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে এর পুরোটা কিংবা কিয়দংশ কেউ অসত্য বলে মনে করলে সে যে উক্ত কালেমা বিশ্বাসে অসত্যবাদী তা সহজেই বুঝা যায়। এ জাতীয় ঈমান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোনোভাবেই জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে পারবে না। বরং সে মুনাফিক বলেই বিবেচিত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨﴾ [البقرة: ٨]

“মানুষদের মাঝে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা বলেঃ আমরা আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি অথচ তারা সত্যিকারার্থে কোনো ঈমানই আনে নি”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮]

৬. উক্ত কালেমার প্রতি বিশ্বাস যে কোনো শির্কের লেশ থেকে মুক্ত করা। তথা তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি কামনায় হতে হবে। তা কাউকে দেখানো বা শুনানো কিংবা দুনিয়ার কোনো লাভ বা ভোগের ইচ্ছায় না হতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[19] আহমদ: ৪/১১।

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُ﴾ [الزمر: ٣]

“জেনে রাখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই জন্য”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ»

“কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ পেয়ে ভাগ্যবান হবে সে ব্যক্তি যে খাঁটি মনে বলেছে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা‘বূদ নেই”।[20]

৭. উক্ত কালেমা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুকেই ভালোবাসা এবং যা এর বিপরীত তা মনভরে ঘৃণা করা। তথা আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা এবং এদের ভালোবাসা সকল ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য দেওয়া। উপরন্তু এঁদের ভালোবাসার সকল শর্ত ও চাহিদা পূরণ করা। তথা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয়, আশা ও সম্মান দিয়ে ভালোবাসা। এমন সকল স্থানকেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন যেমন, মক্কা, মদীনা ও বিশ্বের সকল মসজিদ। এমন সকল সময়কেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন যেমন, রামাযান, জিলহজের প্রথম দশ দিন ইত্যাদি। এমন সকল ব্যক্তিবর্গকেও ভালোবাসা যাদেরকে আল্লাহ

[20] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৯।

তা'আলা ভালোবাসেন যেমন, নবী, রাসূল, ফিরিশতা, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ। এমন সকল কাজকেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন যেমন, সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি। এমন সকল কথাকেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন যেমন, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি।

এর বিপরীতে সকল কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক এবং সকল কুফরী, ফাসিকী ও যে কোনো গুনাহকে অপছন্দ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖ﴾ [المائدة: ٥٤]

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তথা নিজ ধর্ম ত্যাগ করলে তাতে আল্লাহ তা'আলার কিছুই আসে যায় না। বরং অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিবর্তে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি নম্র ও কাফিরদের প্রতি কঠিন থাকবে। তারা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করবে। এ ব্যাপারে তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দা পরোয়া করবে না”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ﴾ [المجادلة: ٢٢]

“তুমি এমন কোনো সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ তা‘আলা ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে, অথচ তারা ভালোবাসে আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল বিরোধীদেরকে। যদিও তারা হোক না তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী”। [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ২২)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْه»

“যার মাঝে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মজা পাবে। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা এবং মুসলিম হওয়ার পর কাফির হওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া বেশি ভালোবাসা”।[21]

এর বিপরীতে কোনো মুমিনকে শত্রু এবং কোনো কাফির ও মুশরিককে বন্ধু মনে করা সত্যিই ঈমান বিরোধী।

---

[21] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩।

معنى شهادة أن محمدا رسول الله

“মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”-এর অর্থ, রুকন ও শর্তসমূহ:

“মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”-এর ভাবার্থ:

কায়মনোবাক্যে এ কথা বিশ্বাস করা ও সাক্ষ্য দেওয়া যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তাঁকে সকল মানব ও জিনের নিকট পাঠানো হয়েছে। অতএব, তিনি আগপরের যা সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করতে হবে। হালাল-হারামের যে বিধান তিনি দিয়েছেন তা মাথা পেতে নিতে হবে। যা আদেশ করেছেন তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাঁর আনীত শরী'আত মানতে হবে এবং তাঁর আদর্শ ধরতে হবে। প্রকাশ্যে ও গোপনে। তাঁর ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, তাঁর আনুগত্য আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই বিরুদ্ধাচরণ। কারণ, তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর একজন বার্তাবাহক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে দীন ইসলাম পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি উম্মতকে এমন পথে রেখে গেছেন যা দিবারাত্র উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। যে এর বাইরে চলবে সেই পথভ্রষ্ট।

“মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”-এর রুকনসমূহ:

এর রুকন হচ্ছে দু'টি:

ক. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই যে আমাদের একমাত্র রাসূল যার আদর্শ ও আনীত শরী'আত আমরা সবাই মানতে বাধ্য -এ কথা বিশ্বাস করা।

খ. তিনি যে আল্লাহ তা'আলার একান্ত বান্দা ও তাঁর প্রিয় রাসূল এ ছাড়া আর কিছুই নন -তা মনেপ্রাণে স্বীকার ও বিশ্বাস করা। তিনি কোনোভাবেই আল্লাহর শরীক নন। তিনি আমাদের মতোই একজন মানুষ। সকল মানবিক বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। তবে তিনি গুনাহ থেকে পবিত্র এবং তাঁর নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অহী আসতো। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূরের তৈরি বলে এবং বলে তাঁর কোনো ছায়া নেই তারা সত্যিই প্রকাশ্য মিথ্যাবাদী এবং যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বদা হাযির-নাযির ভাবে তারা অবশ্যই তাঁকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে স্বীকার করে না, বরং তারা তাঁকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ কিংবা তাঁর ঊর্ধ্বে ভাবে। আমরা তাঁকে অবশ্যই ভালোবাসবো এবং তাঁর ভালোবাসা আমাদের নিজ জীবন, স্ত্রী, সন্তান ও সকল মানুষের ভালোবাসার ওপর আমরা সর্বাধিক প্রাধান্য দেবো। তবে এ ভালোবাসা তিনি পাচ্ছেন তিনি আল্লাহর রাসূল বলেই এবং আমরা তা করছি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যই।

তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিম কুরাশী। তাঁর মা হচ্ছেন আমিনা বিনতে ওয়াহাব। তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হাতীর সালে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মারা যান যখন তিনি

মায়ের গর্ভে। তাঁর জন্ম হলে তাঁর লালন-পালনের সর্বপ্রথম দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর দাদা আব্দুল-মুত্তালিব। অতঃপর তাঁর চাচা আবু তালিব। তাঁর মাতা মারা যান যখন তাঁর বয়স ছয় বছর। তিনি মহান চরিত্র ও উত্তম বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন যাপন করছিলেন। তাতে তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে আল-আমীন খিতাবে ভূষিত করে। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর নিকট সর্ব প্রথম অহী আসে। তখন তিনি ছিলেন হেরা গর্তে। অতঃপর তিনি সবাইকে মূর্তি পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকেন এবং তাঁকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে বলেন। তখন তারা তাঁকে হরেক রকমের কষ্ট দেয়। এতে তিনি ধৈর্য ধরলে মদীনায় হিজরতের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনকে বিশ্বের বুকে জয়ী করেন। অতঃপর ইসলামের সকল বিধান নাযিল হয়। তখন ইসলাম পরাক্রমশালীরূপে পূর্ণতা লাভ করে। পরিশেষে তিনি হিজরী ১১ সনে রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ সোমবার ৬৩ বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে গমন করেন। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর পূর্ণ দায়িত্ব পালেন করেন তথা তাঁর উম্মতকে সকল কল্যাণের পথ বাতলে দেন এবং সকল অকল্যাণ থেকে সতর্ক করেন।

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর শর্তসমূহ:

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি উক্ত সাক্ষ্যর অর্থ সঠিকভাবে জানা। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে তাঁকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ কিংবা

তাঁর ঊর্ধ্বে পৌঁছে দিয়েছে তারা অবশ্যই উক্ত সাক্ষ্যর অর্থ সঠিকভাবে জানে নি।

২. উক্ত সাক্ষ্য প্রশান্তিময় দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করা। যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না। কেউ যদি উক্ত সাক্ষ্যর ব্যাপারে সামান্যটুকুও সন্দেহ পোষণ করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারোর আদর্শ যে বাতিল বলে গণ্য এ ব্যাপারে কোনো ধরণের দ্বিধা-সংশয় বোধ করে তাহলে তার উপরোক্ত সাক্ষ্য অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ﴾ [الحجرات: ١٥]

"নিশ্চয় সত্যিকার ঈমানদার ওরা যারা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান এনেছে। অতঃপর তাতে কোনো ধরণের সন্দেহ পোষণ করে নি"। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে কোনো বান্দা নিঃসন্দেহভাবে সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সে নিশ্চয় জান্নাতে

প্রবেশ করবে"।[22]

৩. উক্ত সাক্ষ্য যা ধারণ করে ও করতে বলে তা সম্পূর্ণরূপে কায়মনোবাক্যে মেনে নেওয়া। তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার, বিশ্বাস ও গ্রহণ করা। এর কোনো কিছুই পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান না করা। যেমন ইয়াহূদী-খ্রিস্টানের আলিমরা তাঁকে ভালোভাবে চিনতো, তাঁর ব্যাপারে উক্ত সাক্ষ্যর অর্থ সঠিকভাবে জানতো এবং তা বিশ্বাসও করতো। তবে তারা তা অহঙ্কারবশতঃ গ্রহণ করেনি ও মেনে নেয় নি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤٦﴾ [البقرة: ١٤٦]

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে চিনে যেমন চিনে নিজ পুত্রসন্তানদেরকে। তবে নিশ্চয় তাদের এক দল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করছে"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৬]

যারা শরী'আতের কোনো বিধান কিংবা দণ্ডবিধি নিয়ে প্রশ্ন তোলে যেমন, চুরি ও ব্যভিচারের দণ্ড অথবা বহু বিবাহের মতো বিধানের ওপর নাক সিটকায় তারা যে উক্ত সাক্ষ্যর চাওয়া-পাওয়া মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারে নি তা সহজেই বুঝা যায়।

---

[22] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭।

৪. উক্ত সাক্ষ্য যা বুঝায় তা সম্পূর্ণরূপে মাথা পেতে নেওয়া। তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা কোনো ধরণের কমানো বাড়ানো ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে ও সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নেওয়া এবং কাজে পরিণত করা। উপরন্তু তা নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবতারণা না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

"তোমার রবের শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয় অতঃপর তোমার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নেয়"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

এ শর্ত ও পূর্বের শর্তের মাঝে পার্থক্য এই যে, পূর্বের শর্ত বলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি উক্ত সাক্ষ্য যা বুঝায় তা মৌখিকভাবে মেনে নেওয়া আর এ শর্ত হচ্ছে তা কার্যগতভাবে মেনে নেওয়া।

যারা শরী'আতের বিচার বাদ দিয়ে মানব রচিত বিচারের নিকট ধর্ণা দেয় তারা যে উক্ত সাক্ষ্যর চাওয়া-পাওয়া মাথা পেতে নিতে পারেনি তা সহজেই বুঝা যায়।

৫. উক্ত সাক্ষ্য যা বুঝায় তা মনেপ্রাণে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় দেওয়া। এ সাক্ষ্যর প্রতি অন্যকে দাওয়াত দেওয়া

এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও তাঁর বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে নিজ সর্বশক্তি বিনিয়োগ করা সত্যিকারার্থেই এ ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩﴾ [التوبة: ١١٩]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং (কথায় ও কাজে) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে এর পুরোটা কিংবা কিয়দংশ কেউ অসত্য বলে মনে করলে সে যে উক্ত সাক্ষ্যর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে অসত্যবাদী তা সহজেই বুঝা যায়। এ জাতীয় ঈমান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোনোভাবেই জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে পারবে না। বরং সে মুনাফিক বলেই বিবেচিত।

৬. উক্ত সাক্ষ্যর প্রতি বিশ্বাস যে কোনো শির্ক থেকে মুক্ত করা। তথা তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনায় হতে হবে। তা কাউকে দেখানো বা শুনানো কিংবা দুনিয়ার কোনো লাভ বা ভোগের ইচ্ছায় না হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ﴾ [الزمر: ٣]

"জেনে রাখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য"। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠﴾ [النساء: ٨٠]

“যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে যেন স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলারই আনুগত্য করলো। আর যে তার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো (তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোনো মানে হয় না) বরং (হে রাসূল! তুমি জেনে রাখো,) আমরা তোমাকে তাদের রক্ষকরূপে পাঠাই নি”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০]

৭. উক্ত সাক্ষ্যর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুকেই ভালোবাসা এবং যা এর বিপরীত তা মনভরে ঘৃণা করা। তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাঁর ভালোবাসাকে সকল ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য দেওয়া। উপরন্তু তাঁর ভালোবাসার সকল শর্ত ও চাহিদা পূরণ করা। তথা তাঁকে মনেপ্রাণে অগাধ সম্মান দিয়ে ভালোবাসা। এমন সকল স্থানকেও ভালোবাসা যেগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন যেমন, মক্কা, মদীনা ও বিশ্বের সকল মসজিদ। এমন সকল সময়কেও ভালোবাসা যেগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন যেমনঃ রামাযান, জিলহজের প্রথম দশ দিন ইত্যাদি। এমন সকল সত্তা ও ব্যক্তিকেও ভালোবাসা যাদেরকে তিনি ভালোবাসতেন যেমন, আল্লাহ তা‘আলা, তিনি ছাড়া অন্যান্য নবী, রাসূল, ফিরিশতা, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ। এমন সকল কাজকেও ভালোবাসা যেগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন যেমন, সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি। এমন সকল কথাকেও ভালোবাসা যেগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন যেমন, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি।

এর বিপরীতে সকল কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক এবং সকল কুফুরী, ফাসিকী ও যে কোনো গুনাহ অপছন্দ করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ﴾ [المائدة: ٥٤]

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তথা নিজ ধর্ম ত্যাগ করলে (তাতে আল্লাহ তা‘আলার কিছুই আসে যায় না, বরং) অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা তাদের পরিবর্তে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি নম্র ও কাফিরদের প্রতি কঠিন থাকবে। তারা আল্লাহ তা‘আলার পথে জিহাদ করবে। এ ব্যাপারে তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দা পরোয়া করবে না”। [সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৫৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ﴾ [المجادلة: ٢٢]

“তুমি এমন কোনো সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ তা‘আলা ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে অথচ তারা ভালোবাসে আল্লাহ

তা‘আলা ও তদীয় রাসূল বিরোধীদেরকে। যদিও তারা হোক না তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী"। [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ২২]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ»

"যার মাঝে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মজা পাবে। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা এবং মুসলিম হওয়ার পর কাফির হওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া বেশি ভালোবাসা"।[23]

এর বিপরীতে কোনো মুমিনকে শত্রু এবং কোনো কাফির ও মুশরিককে বন্ধু মনে করা সত্যিই ঈমান বিরোধী।

যে কোনো গুনাহ’র কাজ করা ও যে কোনো বিদ্’আতে লিপ্ত হওয়া উক্ত সাক্ষ্য বিরোধী। কারণ, যে কোনো গুনাহর গুনাহ’র মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। তেমনিভাবে যে কোনো বিদ‘আতী বিদ‘আতের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু

[23] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও তাঁর সঠিক ইত্তিবা’ থেকে বের হয়ে যায়।

আমলী বিদ‘আতীরা যদি সত্য জানার অগাধ নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সত্য পর্যন্ত পৌঁছুতে না পারে তা হলে হয়তো বা তারা আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমা পেয়ে যেতে পারে তবে তাদের বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। আর বিদ‘আতীদের মধ্যে যারা ইমাম পর্যায়ের বা নেতৃস্থানীয় তারা যদি সত্য বুঝেও তা গ্রহণ না করে তাদের পূর্বেকার বিদ‘আতী কর্মকাণ্ডের ওপর অটল থাকে তাহলে তাদের সাথে আবু জাহল, উতবাহ ও ওলীদের মতো বড়ো বড়ো কাফিরদের কিছুটা হলেও মিল রয়েছে বললে তা তাদের ব্যাপারে বেশি বলা হবে না। যারা একদা নিজেদের পদমর্যাদা টেকানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অহীর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছে। তেমনিভাবে ইমামগণের অনুসারীদের মধ্যেও যারা সত্য বুঝে তা প্রত্যাখ্যান করে তারাও ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿بَلۡ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهۡتَدُونَ ٢٢﴾ [الزخرف: ٢٢]

“বরং তারা বলে, আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও এই একই মতাদর্শের ওপর পেয়েছি। অতএব, আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবো”। [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২২]

صفة الوضوء

ওযুর বিশুদ্ধ পদ্ধতি

১. সর্বপ্রথম অযুর শুরুতে পবিত্রতার নিয়্যাত করবে। তবে মনে রাখবে, নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করার বিষয় নয়। বরং তা মনে সংকল্প করার বিষয়।

২. "বিসমিল্লাহ" পড়ে অযু শুরু করবে।

৩. ডান দিক থেকে অযু শুরু করবে।

৪. দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুয়ে নিবে।

৫. হাত ও পদযুগল ধোয়ার সময় আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলো কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে মলে নিবে।

৬. এক বা তিন চিল্লু (করতলভর্তি পরিমাণ) পানি ডান হাতে নিয়ে তিন তিন বার একই সাথে কুল্লি করবে ও নাকে পানি দিবে এবং বাম হাত দিয়ে নাকের ছিদ্রদ্বয় ভালভাবে ঝেড়ে নিবে।

৭. তিন বার সমস্ত মুখমণ্ডল (কান থেকে কান এবং মাথার সম্মুখবর্তী চুলের গোড়া থেকে চিবুক ও দাড়ির নীচ পর্যন্ত) ধুয়ে নিবে।

৮. দাড়ি খেলাল করবে।

৯. উভয় হাত কনুইসহ তিনবার ধুয়ে নিবে।

১০. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করবে। তথা ভেজানো হাত দু'টো

মাথার সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে এবং পেছনের দিক থেকে মাথার সামনের দিকে টেনে আনবে। উপরন্তু কান দু'টোও মাসেহ করবে। তথা উভয় তর্জনীর মাথা দু'টো উভয় কানে ঢুকাবে এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের বহিরাংশ মাসেহ করবে।

১১. উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধুয়ে নিবে।

১২. অযু শেষে নিম্ন বসনে পানি ছিঁটিয়ে দিবে।

১৩. অযু শেষে নিম্নোক্ত দো'আসমূহ পাঠ করবে।

শাহাদাতাইন পাঠ করবে:

«أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ»

উকবা ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاء»

"তোমাদের কেউ ভালভাবে অযু করে যখন পড়বে: "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআন্না মুহাম্মাদান আব্দুল্লাহি ওয়ারাসূলুহু" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল) তখন তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা উন্মুক্ত করা হবে। তার ইচ্ছে সে যে

কোনো দরজা দিয়েই প্রবেশ করুক না কেন”।[24]

অথবা বলবে:

«أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْن»

’উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ؛ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»

“যে ব্যক্তি অযু করে পড়বে: “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ ’আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজ্’আলনী মিনাত তাওআবীনা ওয়াজ্আল্নী মিনাল্ মুতাতাহহিরীন (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতার্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন) তখন তার জন্য জান্নাতের আটটি

[24] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৭৫।

দরজা উন্মুক্ত করা হবে। তার ইচ্ছে সে যে কোনো দরজা দিয়েই প্রবেশ করুক না কেন"।[25]

নিম্নোক্ত দো'আটিও পড়া যেতে পারে:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ»

উচ্চারণঃ "সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহাম্দিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

"হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আপনার জন্যই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি"।[26]

১৪. পরিশেষে দু'রাকাত সালাত পড়বে। যে ব্যক্তি অযু শেষে কায়মনোবাক্যে দু'রাকাত সালাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাত হবে তার জন্য অবধারিত।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি আমার অযুর ন্যায় অযু করে কায়মনোবাক্যে দু' রাকাত

[25] তিরমিযী, হাদীস নং ৫৫।

[26] আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, হাদীস নং ৮১।

সালাত আদায় করবে আল্লাহ তা‘আলা তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন”।[27]

উকবা ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»

“যে কোনো মুসলিম যখন ভালোভাবে অযু করে কায়মনোবাক্যে দু’রাকাত সালাত আদায় করে, তখন তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়”।[28]

ওযুর ফরয ও রুকনসমূহ:

ধর্মীয় কোনো কাজ বা আমলের ফরয বা রুকন বলতে এমন কিছু ক্রিয়াকর্মকে বুঝানো হয় যা না করা হলে ঐ কাজ বা আমলটি সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয় না যতক্ষণ না সে ঐ কর্মগুলো সম্পাদন করে। অযুর ফরয বা রুকন ছয়টি যা নিম্নরূপ:

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা।

২. কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা।

৩. সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা।

---

[27] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৬।

[28] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪।

৪. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।

৫. ধোয়ার সময় অঙ্গগুলোর মাঝে পর্যায়ক্রম বজায় রাখা।

৬. অযুর সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

ওযুর শর্তসমূহ:

ওযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য দশটি শর্ত রয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. অযুকারী মুসলিম হতে হবে। অতএব, কাফির বা মুশরিক অযু করলেও তার অযু শুদ্ধ হবে না। তাই সে অযু বা গোসল করে কখনো পবিত্র হতে পারবে না।

২. অযুকারী জ্ঞানসম্পন্ন থাকতে হবে। অতএব, পাগল ও মাতালের অযু শুদ্ধ হবে না। যতক্ষণ না তাদের চেতনা ফিরে আসে।

৩. অযুকারী ভালমন্দ ভেদাভেদ জ্ঞান রাখে এমন হতে হবে। অতএব, বাচ্চাদের অযু শরী'আতে ধর্তব্য নয়। তাদের অযু করা-না করা সমান।

৪. নিয়্যাত করতে হবে। অতএব, নিয়্যাত ব্যতীত অযু গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. অযু শেষ হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতার্জনের নিয়্যাত বহাল থাকতে হবে। অতএব, অযু চলাকালীন নিয়্যাত ভঙ্গ করলে অযু শুদ্ধ হবে না।

৬. অযু চলাকালীন অযু ভঙ্গের কোনো কারণ যেন পাওয়া না যায়। তা না হলে অযু তৎক্ষণাৎই ভেঙ্গে যাবে।

৭. অযুর পূর্বে মলমূত্র ত্যাগ করে থাকলে ঢেলাকুলুপ বা পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে হবে।

৮. অযুর পানি পবিত্র ও জায়েয পন্থায় সংগৃহীত হতে হবে।

৯. অযুর অঙ্গগুলোতে পানি পৌঁছুতে বাধা প্রদান করে এমন বস্তু অপসারণ করতে হবে।

১০. অযু ভঙ্গের কারণ সর্বদা পাওয়া যাচ্ছে এমন ব্যক্তির জন্য সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হতে হবে। অর্থাৎ সালাতের সময় হলেই কেবল এমন ব্যক্তিরা অযু করবে।

نواقض الوضوء

অযু ভঙ্গের কারণসমূহ

অযু করার পর নিম্নোক্ত কারণগুলোর কোনো একটি কারণ সংঘটিত হলে অযু বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. মল-মূত্রদ্বার দিয়ে কোনো কিছু বের হলে:

বায়ু, বীর্য, মযী, ওদী, ঋতুস্রাব, নিফাস ইত্যাদি এরই অন্তর্ভুক্ত। এ সকল বস্তু মল বা মূত্রদ্বার দিয়ে বের হলে অযু বিনষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾ [المائدة: ٦]

"তোমাদের কেউ বাথরুম থেকে মলমূত্র ত্যাগ করে আসলে অথবা স্ত্রী সহবাস করলে (পানি পেলে অযু বা গোসল করে নিবে) অতঃপর পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে"। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬]

সাফওয়ান ইবন আসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ؛ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে রওয়ানা করলে তিনি আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মলমূত্র ত্যাগ বা ঘুম

যাওয়ার কারণে মোজা না খুলতে আদেশ করতেন, বরং মোজার উপর মাসাহ করতে বলতেন, তবে শুধু জানাবাতের গোসলের জন্য মোজা খুলতে বলতেন"।[29]

আব্বাদ ইবন তামীম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলেন যে, কারো কারোর ধারণা হয় সালাতের মধ্যে অযু নষ্ট হয়েছে বলে। তখন তাকে কী করতে হবে? তিনি বললেন:

«لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيْحاً»

"সে সালাত ছেড়ে দিবে না যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গমনধ্বনি বা দুর্গন্ধ পায়"।[30]

২. ঘুম বা অন্য যে কোনো কারণে অবচেতন হলে।

'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ»

"চক্ষুদ্বয় গুহ্যদ্বারের পাহারাদার। অতএব, যে ব্যক্তি ঘুমাবে তাকে অবশ্যই অযু করতে হবে"।[31]

---

[29] তিরমিযী, হাদীস নং ৯৬ ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৮৩।

[30] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৬১ ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৫১৯।

এ ছাড়া উন্মাদনা, সংজ্ঞাহীনতা ও মাদকতা ইত্যাদির কারণে চেতনাশূন্যতা দেখা দিলেও সকল আলেমের ঐকমত্যে অযু ভেঙ্গে যাবে।

৩. কোনো আবরণ ছাড়াই হাত দিয়ে লিঙ্গ বা গুহ্যদ্বার স্পর্শ করলে।

উম্মে হাবিবা ও আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তারা বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

"যে ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করল সে যেন অযু করে নেয়"।[32]

৪. উটের গোশত খেলে।

বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُـوْمِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: لاَ تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উটের গোস্ত খেয়ে অযু করতে হবে কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, উটের গোশত খেলে অযু করতে হবে। তেমনিভাবে তাঁকে ছাগলের গোশত সম্পর্কে

---

[31] আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৮২।

[32] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৮৬, ৪৮৭ ইবন হিববান, হাদীস নং ১১১৪, ১১১৫, ১১১৭।

জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ছাগলের গোশত খেলে অযু করতে হবে না"।[33]

৫. মুরতাদ (দীন ইসলাম পরিত্যাগ করেছে যে) হয়ে গেলে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥]

"যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফুরী করবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫]

---

33 আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৯৯।

موجبات الغسل

যখন গোসল করা ফরয

নিম্নোক্ত চারটি কারণের যে কোনো একটি কারণ সংঘটিত হলে যে কোনো পুরুষ বা মহিলার ওপর গোসল করা ফরয। উপরন্তু মহিলাদের গোসল ফরয হওয়ার জন্য আরো দু'টি বাড়তি কারণ রয়েছে। সে কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হলে:

উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়ে যায়। তেমনিভাবে স্বপ্নদোষ হলেও। তবে তাতে উত্তেজনার কথা মনে থাকা শর্ত নয়।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا الْـمَاءُ مِنَ الْـمَاءِ»

"বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হয়"।[34]

২. স্ত্রী সহবাস করলে:

স্ত্রীসঙ্গম করলে গোসল করতে হয়। বীর্যপাত হোক বা নাই হোক।

আয়শা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[34] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪৩।

«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

“যখন কোনো পুরুষ স্ত্রীসঙ্গমের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নেয় এবং পুরুষের লিঙ্গাগ্র স্ত্রীর যোনিদ্বারকে অতিক্রম করে (বীর্যপাত হোক বা নাই হোক) তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়”।[35]

৩. কোনো কাফির ব্যক্তি মুসলিম হলে:

চাই সে আদতেই কাফির থেকে থাকুক অতঃপর মুসলিম হয়েছে অথবা ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ (পুনরায় কাফির) হয়ে অতঃপর মুসলিম হয়েছে।

কাইস ইবন আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيْدُ الإِسْلاَمَ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আসলে তিনি আমাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে আদেশ করেন”।[36]

৪. যুদ্ধক্ষেত্রের শহীদ ব্যতীত যে কোনো মুসলিম ইন্তেকাল করলে:

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[35] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪৯।

[36] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৫; তিরমিযী, হাদীস নং ৬০৫; নাসাঈ, হাদীস নং ১৮৮।

«بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَـةَ، إِذْ وَقَعَ مِـنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ» «فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ، وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً»

"একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই হজ মৌসুমে আরাফায় অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে উট থেকে পড়ে গেলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। কিছুক্ষণ পর সে মারা গেলে তার ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ণগোচরে আনা হলে তিনি বলেন, তাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও। অতঃপর তাকে খোশবু লাগিয়ে ইহরামের কাপড় দু'টিতেই কাফন দিয়ে দাও; কিন্তু তার মাথা ঢেকে দিবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিবসে তালবিয়্যাহ্ পড়াবস্থায়ই পুনরুত্থিত করবে"।[37]

৫. মহিলাদের ঋতুস্রাব হলে: তবে গোসল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া পূর্ব শর্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢﴾ [البقرة: ٢٢٢]

---

[37] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০৬।

“তারা (সাহাবীগণ) আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে; আপনি বলুন: তা হচ্ছে অশুচিতা। অতএব, তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট যাবে না ও তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। তবে যখন তারা (গোসল করে) ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে যাবে তখনই তোমরা তাদের সাথে সন্মুখ পথে সহবাস করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাওবাকারী ও পবিত্রতা অন্বেষণকারীদের ভালোবাসেন”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২২]

৬. নিফাস বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব নির্গত হলে।

তবে নিফাস থেকে গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়া পূর্ব শর্ত। নিফাস ঋতুস্রাবের ন্যায়। বরং তা ঋতুস্রাবই বটে। বাচ্চাটি মায়ের পেটে থাকাবস্থায় তার নাভিকূপের মধ্য দিয়ে তন্ত্রী যোগে এ ঋতুস্রাবই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো। তাই বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ঋতুস্রাবটুকু কোনো বিতরণক্ষেত্র না পাওয়ার দরুন যোনিপথে বের হয়ে আসছে। নিফাস সন্তান প্রসবের সাথে সাথে অথবা উহার পরপরই বের হয়। তেমনিভাবে সন্তান প্রসবের এক/দুই/তিন দিন পূর্ব থেকেও প্রসব বেদনার সাথে বের হয়। শরী‘আতের পরিভাষায় ঋতুস্রাবকেও নিফাস বলা হয়।

সমস্ত আলিম সম্প্রদায় নিফাসের পর গোসল করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত।

صفة الصلاة

সালাত আদায়ের বিশুদ্ধ পদ্ধতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ»

“তোমরা সালাত পড়ো যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখেছো।”

সালাত পড়ার পূর্বে সর্বপ্রথম (অযু, গোসল কিংবা তায়াম্মুমের মাধ্যমে) ভালোভাবে পবিত্রতার্জন করবে। এমতাবস্থায় সালাত আদায়কারীর শরীর, কাপড় ও সালাতের জায়গা পবিত্র হতে হবে।

১. কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তা‘আলার দিকে পুরাপুরি মনোযোগী ও ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যে সালাত পড়ার ইচ্ছা তা সঠিকভাবে মনে করে উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে “আল্লাহু আকবার” বলে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে কব্জি ধরে উভয় হাত বুকের উপর রাখবে।

মুখে সালাতের নিয়্যাত না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, না খুলাফায়ে রাশিদীন, না ইসলামের প্রসিদ্ধ ইমামগণ।

ইমাম সাহেব ও একাকী সালাত আদায়কারী নিজেদের সামনে তথা ক্বিব্লার দিকে একটি “সুত্রাহ” তথা আধা হাত সমপরিমাণ কোনো কিছু খাড়া করে রাখবে। তা করা সুন্নাত।

২. বুক থেকে চিবুক একটু দূরে রেখে মাথা খানা খানিকটা ঝুঁকিয়ে সাজদাহ'র জায়গার দিকে দৃষ্টি রাখবে।

৩. এরপর নিম্নোক্ত দো'আটি পড়বে:

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ»

"হে আল্লাহ! আপনি আমি ও আমার গুনাহ'র মাঝে এতটুকু দূরত্ব সৃষ্টি করুন যতটুকু দূরত্ব রয়েছে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করুন যেভাবে পবিত্র করা হয়ে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহগুলো ধুয়ে দিন পানি, বরফ ও শিলা বৃষ্টি দিয়ে।[38]

অথবা বলবে:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

"হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি । আপনার নাম বরকতময় এবং আপনার মর্যাদা অতিশয় সুউচ্চ। আপনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বূদ নেই"।[39]

[38] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৯৮।

[39] আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৭৫; তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৩।

৪. “আঊযু বিল্লাহ”, “বিসমিল্লাহ” বলে সূরা ফাতিহা পুরোটা পড়ে উচ্চ স্বরে “আমীন” বলবে এবং এরই পাশাপাশি অন্য যে কোনো সূরা কিংবা উহার সমপরিমাণ কয়েকটি আয়াত পড়বে। তবে তা ফজরের সালাতে বড় তথা সূরা “ক্বাফ” ও সূরা “নাবা” এর মধ্যকার কোনো একটি সূরা, মাগরিবের সালাতে ছোট তথা সূরা “যু’হা” ও সূরা “নাস” এর মধ্যকার কোনো একটি সূরা এবং অন্যান্য সালাতে মাঝারি তথা সূরা “নাবা” ও সূরা “যুহা” এর মধ্যকার কোনো একটি সূরা হওয়া ভালো, তবে কখনো কখনো ফজর ছাড়া অন্যান্য সালাতও বড় সূরা দিয়ে পড়া যেতে পারে, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই করেছেন।

৫. উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে “আল্লাহু আকবার” বলে রুকুতে যাবে। রুকুতে পিঠ ও মাথা সমান এবং উভয় হাত হাঁটুর উপর প্রসারিত থাকবে। রুকুতে প্রশান্তির সাথে তিন বা তিনের অধিক বার বেজোড় সংখ্যায় বলবে: “সুবহানা রাব্বিয়াল-’আযীম” অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এর পাশাপাশি আরো বলবে:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ»

“হে আমাদের রব! হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।[40]

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الـْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

[40] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৪।

“ফিরিশতাগণ ও জিবরীলের রব অতি পবিত্র”।[41]

৬. রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত উঁচিয়ে ইমাম ও একা সালাত আদায়কারী বলবে:

«سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ»

“আল্লাহ তা‘আলা প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেছেন”।[42]

৭. এ সময় ডান হাত বাম হাতের ওপর বুকে রেখে মুক্তাদি ও একা সালাত আদায়কারী বলবে:

«رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ বা رَبَّنَا وَلَكَ الْـحَمْدُ বা اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ বা اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْـحَمْدُ»

“হে আমাদের রব! অথবা হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আপনার জন্যই আমাদের সকল প্রশংসা”।[43]

৮. আরো বলবে:

«حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اللَّهُمَّ! لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذاَ الْـجَدِّ مِنْكَ الْـجَدُّ»

---

[41] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৭।

[42] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪১১।

[43] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩২, ৭৮৯, ৭৯৫, ৭৯৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৯, ৪১১।

“(হে আমাদের রব! আপনার জন্যই আমাদের সকল প্রশংসা) বরকতময় ও পবিত্র অনেক অনেক প্রশংসা। আকাশ, জমিন ও অন্যান্য সকল বস্তু যা আপনি চান তা সমপরিমাণ। আপনি হচ্ছেন সকল স্তুতি-বন্দনা ও সম্মানের অধিকারী! বান্দা আপনার শানে যতটুকুই স্তুতি-বন্দনা করুক তা সবটুকুরই আপনি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আর আমরা সবাই তো আপনারই বান্দা। হে আল্লাহ! আপনার দানে কেউ বাধা প্রদান করতে পারে না। আপনার নিষেধ উপেক্ষা করে কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না। কোনো ধনবান ব্যক্তির ধন-দৌলত তাকে আপনার ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারে না”।[৪৪]

৯. সাজদাহ’র জন্য “আল্লাহু আকবার” বলে প্রথমে দু’হাঁটু অতঃপর দু’ হাত এবং কপাল ও নাক জমিনে রাখবে। মনে রাখবে যেন সাজদাহ সর্বমোট সাতটি অঙ্গের ওপর হয়। তা হচ্ছে, কপাল ও নাক, দু’হাত, দু’হাঁটু ও দু’পায়ের আঙ্গুলসমূহ। সাজদাহ’র সময় হাতের উভয় কনুইকে জমিন ও উভয় হাঁটু থেকে দূরে রাখবে। তেমনিভাবে উভয় বাহুকে উভয় পার্শ্ব থেকে এবং পেটকে উভয় রান থেকে দূরে রাখবে। উপরন্তু পিঠকে একেবারে লম্বা করে সাজদাহ দিবে না যাতে শরীরের পুরো ভারটুকু কপালের উপর না পড়ে। এ সময় উভয় হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবামুখী, স্বাভাবিক ও মিলানো থাকবে, তবে হাত দু’টো কাঁধ বা কান বরাবর রাখবে। গোড়ালি দু’টো একটি আরেকটির সাথে মিলিয়ে রাখবে।

---

[44] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৭, ৪৭৮।

১০. সাজদায় গিয়ে প্রশান্তির সাথে তিন বা তিনের অধিক বার বেজোড় সংখ্যায় বলবেঃ "সুবহানা রাব্বিয়াল-আ'লা" অর্থাৎ আমি আমার সুমহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এর পাশাপাশি রুকুর বাকি দো'আ দু'টোও পড়বে এবং তাতে নিজের ও দুনিয়ার সকল মুসলিমদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতেরসমূহ কল্যাণ কামনা করবে। কারণ, তাতে দো'আ কবুল হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

"জেনে রাখো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে রুকু বা সাজদাহ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে। অতএব, রুকু অবস্থায় তোমরা প্রভুর মহত্ব বর্ণনা করবে এবং সাজদাহ অবস্থায় বেশি বেশি দো'আ করবে। কারণ, তাতে দো'আ কবুল হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে"।[45]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»

---

[45] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৯।

"সাজদাহ অবস্থায় বান্দা সব চাইতে বেশি নিজ প্রভুর নিকটবর্তী হয়। অতএব, তোমরা তাতে বেশি বেশি দো'আ করো"।[46]

১১. "আল্লাহু আকবার" বলে সাজদাহ থেকে উঠে ডান পা খাড়া করে এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর স্থির হয়ে বসবে। এমতাবস্থায় ডান হাত ডান রান বা হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম রান বা হাঁটুর উপর রাখবে, তবে ডান হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে অথবা মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে রিংয়ের রূপ সৃষ্টি করবে। আর শাহাদাত অঙ্গুলিটি খোলা রেখে তা দো'আর প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের সময় উঠাবে। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত দো'আগুলো বলবে: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ»

"হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমার বিপদ দূর করুন, আমাকে সুস্থ করুন, আমাকে হিদায়াত দিন ও আমাকে রিযিক দিন"।[47]

অথবা বলবে, «رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ»

১২. "আল্লাহু আকবার" বলে দ্বিতীয় সাজদাহ করবে যেভাবে প্রথম সাজদাহ করেছে।

১৩. "আল্লাহু আকবার" বলে উভয় হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দ্বিতীয়

---

[46] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮২।

[47] আবু দাউদ, হাদীস ৮৫০ ইবন মাজাহ, হাদীস ৮৯৭, ৮৯৮।

রাকাতের জন্য উঠবে। প্রয়োজনে দু'হাতের উপর ভর দিয়েও উঠা যেতে পারে। দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠার পূর্বে প্রয়োজনে সামান্য সময়ের জন্য বসাও যেতে পারে। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বয়সে করেছেন। কেউ সর্বদা তা করলেও তাতে কোনো অসুবিধে নেই। দ্বিতীয় রাকাতে তাই করবে যা প্রথম রাকাতে করেছে। তবে তাতে প্রথম রাকাতের শুরুতে যে দো'আটি তথা সানা পড়েছে তা আর পড়বে না। তেমনিভাবে সূরা ফাতিহার শুরুতে 'আউযু বিল্লাহ" না বললেও চলবে।

১৪. দ্বিতীয় রাকাত শেষে "আল্লাহু আকবার" বলে স্থির হয়ে বসবে যেমনিভাবে বসেছে দু' সাজদাহ'র মাঝখানে। অতঃপর বলবে:

«اَلتَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَـوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

"সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য। (হে নবী) আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। তেমনিভাবে আমাদের ওপর ও আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোনো মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার

বান্দা ও তদীয় রাসূল”।[48]

এরপর বলবে:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيْدٌ»

“হে আল্লাহ! আপনি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর দয়া করুন যেমনিভাবে আপনি দয়া করেছেন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে বরকত দিন যেমনিভাবে আপনি বরকত দিয়েছেন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত সম্মানিত”।[49]

আরো বলবে:

«اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْـمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْـمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْـمَمَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْـمَأْثَمِ وَالْـمَغْرَمِ»

“হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব, মাসীহ্ নামক দাজ্জালের ফিৎনা এবং জীবদ্দশা ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা

[48] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৩১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০২।

[49] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৬।

থেকে। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি গুনাহ ও ঋণ থেকে”।[50]

এরপর নিজের ও দুনিয়ার সকল মুসলিমদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতেরসমূহ কল্যাণ কামনা করবে।

১৫. যদি সালাতটি তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট হয় তা হলে প্রথম “তাশাহুদ” তথা “আত্তাহিয়্যাতু” শেষ করে “আল্লাহু আকবার” বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে। অতঃপর বাকি এক বা দু’রাকাত দ্বিতীয় রাকাতের মতোই পড়বে, তবে তাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোনো সূরা মিলাবে না। কখনো কখনো কোনো সূরা বা আয়াত মিলালেও তাতে কোনো অসুবিধে নেই।

১৬. যদি সালাতটি তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট হয় তাহলে তৃতীয় বা চতূর্থ রাকাত শেষ করে দ্বিতীয় “তাশাহহুদ” তথা “আত্তাহিয়্যাতু” পড়ার জন্য ডান পা খাড়া করে বাম পা ডান পায়ের নিচ দিয়ে বের করে দিয়ে জমিনের উপর নিতম্ব লাগিয়ে বসবে অথবা উভয় পা ডান দিক থেকে বের করে দিবে এবং জমিনের উপর বিছিয়ে রাখবে আর বাম পা ডান পায়ের নিচ দিয়ে বের করে দিবে কিংবা ডান পা বিছিয়ে রাখবে এবং বাম পা ডান পা ও রানের মাঝখানে রাখবে। এরপর “তাশাহহুদ” তথা “আত্তাহিয়্যাতু”, দুরূদ ও উল্লিখিত দো‘আটি পড়বে এবং নিজের ও

---

[50] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৮, ৫৮৯।

দুনিয়ার সকল মুসলিমদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতেরসমূহ কল্যাণ কামনা করবে। অতঃপর “আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বলে ডানে ও বাঁয়ে সালাম ফিরাবে।

حقيقة العلمانية في ضوء ما ورد في الكتاب والسنة

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এমন মতবাদ যা কোনো ব্যাপারে যে কোনো ধর্মের পক্ষপাতিত্ব না করে না, তথা যে কোনো ধর্মের নিয়ন্ত্রণ কিংবা অনুশাসন না মানার প্রতি আহ্বান করে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারীরা কিন্তু উক্ত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নয়। কারণ, তাদের অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে যে কোনো ধর্মের কিছু না কিছু অনুশাসন মেনে চলে। তাই তাদের অনেককেই কখনো কখনো সালাত, সাওম, হজ, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত কিংবা অমূলক কেচ্ছা ও ফযীলত সর্বস্ব ওয়ায মাহফিল ও বয়ান শুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। অতএব, পারিভাষিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে এমন মতবাদকে বুঝানো হয় যে মতবাদে যে কোনো ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। এ ছাড়া আর অন্য কোথাও নয়। তাদের মতে যে কোনো রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করতে পারে না। অন্য কথায় যে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র নীতিগতভাবে কোনো ধর্মের পক্ষপাতিত্ব কিংবা ধর্মকে ব্যবহার করে না। যদিও কোনো কোনো রাষ্ট্র কিংবা প্রশাসন জনগণের কঠিন চাপের মুখে কোনো না কোনো সময় যে কোনো ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করে। তবে মনে রাখতে হবে এ জাতীয় ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব নীতিগত নয় বরং তা চাপের মুখে।

তাই বলতে হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নতুন দর্শন ও একটি নতুন বিপ্লব। যা তার ভক্তদেরকে রাষ্ট্র থেকে যে কোনো ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে রেখে একমাত্র দুনিয়ার ক্ষণিকের ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়ার সবক শিখায়। তাদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে দুনিয়া। তাদের অধিকাংশই আখিরাত ও আখিরাতের যে কোনো কর্মকান্ডের প্রতি তেমন একটা ভ্রূক্ষেপ করে না। তাই এদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী যথাযথভাবে প্রযোজ্য।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْـخَمِيْصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوْبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِيْ الْحِرَاسَةِ كَانَ فِيْ الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِيْ السَّاقَةِ كَانَ فِيْ السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ»

“ধ্বংস হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম! ধ্বংস হোক পোশাক-পরিচ্ছদের গোলাম! তাকে কিছু দিলে খুশি। না দিলে বেজার। ধ্বংস হোক! কখনো সে সফলকাম না হোক! সমস্যায় পড়লে সমস্যা থেকে উদ্ধার না হোক! (কাঁটা বিঁধলে না খুলুক)। জান্নাত ঐ ব্যক্তির জন্য যে সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরেই আছে। মাথার চুলগুলো তার এলোমেলো। পা যুগল ধূলিমলিন। সেনাবাহিনীর পাহারায় দিলেও রাজি। পশ্চাতে দিলেও রাজি। ওপরস্থদের নিকট অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না। কারোর জন্য সুপারিশ করলে তার সুপারিশ

গ্রহণ করা হয় না”।[৫১]

সর্বদা কেউ দুনিয়া কামানোর নেশায় মত্ত থাকলে দুনিয়া যে নিশ্চিতভাবেই সম্পূর্ণরূপে তার হাতে ধরা দিবে তাও কিন্তু সঠিক নয়। বরং আল্লাহ তা‘আলা যাকে যতটুকু দিতে চাবেন সে ততটুকুই পাবে। এর বেশি কিছু সে পাবে না। আর ভাগ্যক্রমে সে তার চাহিদানুযায়ী দুনিয়ার সবটুকু পেলেও পরকালে তার জন্য নির্ধারিত থাকবে শুধু জাহান্নাম এবং তার সকল আমল বাতিল বলেই গণ্য হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومٗا مَّدۡحُورٗا ١٨﴾ [الاسراء: ١٨]

“কোন ব্যক্তি পার্থিব কোনো সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা অতিসত্বর দিয়ে থাকি। অতঃপর আমরা তার জন্য নির্ধারিত করে রাখি জাহান্নাম। যাতে সে প্রবেশ করবে অপমানিত ও লাঞ্ছিতভাবে”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٦﴾ [هود: ١٥، ١٦]

---

51 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৮৬, ২৮৮৭; বায়হাক্বী: ৯/১৫৯, ১০/২৪৫।

“যারা পার্থিব জীবন ও উহার সাজসজ্জা চায় আমরা তাদের কৃতকর্মের ফল পূর্ণভাবে দুনিয়াতেই দিয়ে দেবো। এতটুকুও তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। এরা এমন যে, আখিরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাদের সকল আমল তখন অকেজো এবং নিষ্ফল বলে বিবেচিত হবে”। [সূরা হূদ, আয়াত: ১৫, ১৬]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যখন দুনিয়াকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে চাই তা শরী‘আতসম্মত হোক বা নাই হোক তখন শরী‘আতের কোনো অনুশাসন তাদের স্বার্থ বিরোধী হলেই তারা তা কখনো আইনগতভাবে রহিত করবে অথবা কমপক্ষে তার বিরুদ্ধে বলবে।

অতএব, বলতে হয়, যারা বিচারের ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধানকেই প্রাধান্য দেয় এবং শরী‘আতের বিধি-বিধানকে রহিত করে তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। যারা হারাম বস্তুসমূহ যেমন, ব্যভিচার, মদ্যপান, গানবাদ্য কিংবা সুদী কাজ-কারবার ইত্যাদি সমাজে চালু করে এ মনে করে যে, এগুলো নিষেধ করলে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হবে তারাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। যারা শরী‘আতের দণ্ডবিধি তথা হত্যাকারীকে হত্যা, ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাত করা অথবা সে বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করা, মদপানকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত করা, চোরের হাত কাটা কিংবা সন্ত্রাসীকে হত্যা করা, ফাঁসী দেওয়া, বিপরীতভাবে তার হাত-পা কেটে ফেলা কিংবা তাকে দূরের কোনো জেলে আটকে রাখা ইত্যাদি অস্বীকার করে কিংবা আইনগতভাবে নিষেধ করে এ মনে করে যে, এগুলো

বাস্তবায়ন করা বিশ্রী, কঠোরতা ও মানবতা বিরোধী তারাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যখন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ছাড়া আর কোথাও কোনো ধর্মের স্বীকৃতি দেয় না তাই তা হচ্ছে একটি শির্কী ও কুফুরী মতবাদ। কারণ, তাতে যেমন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয় না তথা এ সকল ব্যাপারে শরী'আতের বিধানের প্রতি কুফুরী করা হয় তেমনিভাবে এ সকল ক্ষেত্রে সংসদ বা আইন পরিষদকে আইন বা বিধান রচনার অধিকার দেওয়া হয় তথা এ সকল ব্যাপারে সাংসদ ও আইনজ্ঞদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলার অংশীদার করা হয় তাই তা একই সময়ে কুফুরী এবং শির্ক।

একজন মুসলিম তার জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ইসলামের সকল বিধি-বিধান মানতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য অন্য কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তিনিই তো স্রষ্টা। অতএব, তিনিই একমাত্র বিধানদাতা, আর অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ﴾ [آل عمران: ١٩]

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ধর্ম"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [ال عمران: ٨٥]

“যে কেউ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই গ্রহনযোগ্য হবে না এবং পরকালে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫]

নিজের ইচ্ছা মাফিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মকে মানা আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু মানা এটা মূলতঃ ইয়াহূদীদেরই চরিত্র।

আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলেন,

﴿أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥]

“তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস করো আর কিয়দংশ অবিশ্বাস করো। তোমাদের মধ্যে যারা এমন করবে তাদের জন্য এ পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ছাড়া আর কিছুই নেই। উপরন্তু তাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির প্রতি সোপর্দ করা হবে। আর আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের কর্মের প্রতি কখনোই গাফিল নন”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৫]

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফুরী ও শির্কী চেতনা থেকে রক্ষা করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল-আলামীন।

حقيقة القومية في ضوء ما ورد في الكتاب والسنة

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ মানে এমন একটি মতবাদ যা মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বজাতিচেতনা কিংবা স্বজাতিপ্রীতি ধারণ করার আহ্বান জানায়। এতে সত্য কিংবা ন্যায়ের কোনো ধার ধারা হয় না, বরং তাতে সাধারণত মানুষের যে কোনো সমষ্টিগত জীবনে বিশেষত রাজনৈতিক জীবনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। চাই তা সঠিক হোক কিংবা বেঠিক।

মূলতঃ উক্ত মতবাদটি খ্রিস্টানদেরই সৃষ্ট একটি মতবাদ। মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে যার বিপুল বিস্তারের মাধ্যমে তারা ইসলামকেই ধ্বংস করার মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বলতে হয়, এ ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় তারা প্রায় অধিকাংশটুকুই সফলকাম। ধারণা করা হয়, তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপেও সফল হতো যদি না মহান আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নিতেন। এ জন্যই তো বর্তমান যুগের খ্রিস্টান মোড়লরা এ সহজবোধ্য ও প্রকৃতিগত চেতনাটুকুকে সর্বদা এ বিশ্বের বুকে অটুট রাখার জন্য যে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে চাকচিক্যময় ধোঁকাপূর্ণ খেয়ালী কথার ফুলঝুরির মাধ্যমে অনবরত সাহস ও মনোবল যোগিয়ে যাচ্ছে। কারণ, এ প্রচেষ্টায় যেমন দীন ইসলাম ধীরে ধীরে বিশ্বের বুকে তার অদম্য শক্তি হারাবে, টিকে থাকবে শুধু তার নামটুকু তেমনিভাবে কোনো এলাকায় কারোর জন্য তাদের খ্রিস্টধর্মের এমনকি অন্য যে কোনো ধর্মের গতিরোধ করাও

কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। এদের খপ্পরে আজ আরব-অনারব তথা বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিমই নিপতিত। এতে করে বিশ্বের সকল ইসলাম বিদ্বেষী ও কাফির শক্তি খুবই আনন্দিত।

আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী প্রতিটি মুসলিমের জানা উচিৎ যে, এ জাতীয়তাবাদের ডাক হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিমকে ধ্বংস করার জন্য মহা ষড়যন্ত্রমূলক একটি পরিকল্পিত অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর প্রকাশ্য অন্যায়মূলক জাহেলী যুগের বাতিল ডাক, যা নিম্নোক্ত কয়েকটি পয়েন্টের মাধ্যমে সবার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

১. মুসলিম বিশ্বের যে কোনো অঞ্চলের যে কোনো জাতীয়তাবাদী ডাক মুসলিমদের আন্তর্জাতিক মহা ঐক্যের গোড়ায় একটি মারাত্মক কুঠারাঘাত। যা বিশ্বের সকল মুসলিমকে অঞ্চল ও ভাষাগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতি-সত্তায় রূপান্তরিত করে। তখন তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্য যে কোনো মুসলিম জাতির সাথে শত্রুতা পোষণ করে। আর যে কোনো চিন্তা-চেতনা মুসলিমদের মধ্যে দলাদলি কিংবা ফাটল সৃষ্টি করে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারণ, ইসলাম সর্বদা তার অনুসারীদেরকে মহান ঐক্যের দিকেই ডাকে, দলাদলির দিকে নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ﴾ [ال عمران: ١٠٣]

“তোমরা সবাই এক হয়ে এক আল্লাহর রজ্জু শক্ত হাতে ধারণ করো। কখনো নিজেদের মধ্যে দলাদলি করো না”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

২. ইসলাম জাহেলী যুগের সকল প্রকারের ডাক প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি জাহিলী যুগের সকল কর্মকাণ্ড এবং চাল-চরিত্রকেও। তবে ইসলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাহিলী যুগের কিছু উন্নত চরিত্র ও কর্মকাণ্ডকে সাপোর্ট করে। যা নিজ নিজ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে এ জাতীয়তাবাদী ডাক হচ্ছে জাহিলী ডাক।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, ইসলাম ও কুরআনের ডাক ছাড়া যে কোনো ডাক চাই তা যে কোনো বংশের দিকে হোক অথবা যে কোনো অঞ্চল, জাতি, মাযহাব ও তরীকার দিকে তা সবই জাহিলী ডাক। বরং যখন একদা এক যুদ্ধে জনৈক মুহাজির সাহাবী জনৈক আনসারী সাহাবীর পেছনে তার হাত দিয়ে আঘাত করে, তখন আনসারী সাহাবী সকল আনসারীগণকে ডাক দিয়ে বললোঃ হে আনসারীগণ! তোমরা কোথায়? দ্রুত আমার সহযোগিতায় নেমে আসো। তখন মুহাজির সাহাবীও বললো: হে মুহাজিরগণ! তোমরা কোথায়? দ্রুত আমার সহযোগিতায় নেমে আসো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জাতীয় ডাক শুনে বললেন:

«مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْـمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»

“এ কি হচ্ছে। জাহিলী ডাক শোনা যাচ্ছে কেন? সাহাবীগণ বললেন: হে

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জনৈক মুহাজির সাহাবী জনৈক আনসারী সাহাবীর পেছনে তার হাত দিয়ে আঘাত করে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ জাতীয় ডাক ছাড়ো। কারণ, তা একটি অতি ঘৃণ্য ডাক"।[52]

৩. যে কোনো জাতীয়তাবাদী ডাক সে জাতির কাফির ও মুশরিকদেরকে ভালোবাসার একটি বিরাট মাধ্যম। কারণ, সময় সময় জাতীয়তাবাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। যার কারণে তারা একদা নিজের প্রাণের বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়। এ দিকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা শরী'আতের দৃষ্টিতে ঈমান বিধ্বংসী একটি বিশেষ কারণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمۡ يَقُولُونَ نَخۡشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٞۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرٖ مِّنۡ عِندِهِۦ فَيُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ نَٰدِمِينَ ٥٢﴾ [المائدة: ٥١، ٥٢]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের কেউ তাদেরকে

---

[52] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৪।

বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের মধ্যেই পরিগণিত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা যালিম সম্প্রদায়কে কখনোই সঠিক পথ দেখান না। যাদের অন্তরে মুনাফিকির ব্যাধি রয়েছে তুমি তাদের অনেককেই দেখবে তারা কাফিরদের প্রতি দ্রুত দৌড়ে যায়। তারা বলেঃ আমাদের ভয় হচ্ছে আমাদের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়ে না কি? আশা তো অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে পূর্ণ বিজয় দিবেন অথবা তিনি নিজ পক্ষ থেকে কোনো সুবিধা বের করে দিবেন। তখন তোমরা নিজেদের অন্তরে লুক্কায়িত মনোভাবের জন্য লজ্জিত হবে”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫১-৫২]

আল্লাহ তা‘আলার উক্ত ফরমান কতই না সুন্দর, সুস্পষ্ট ও অত্যন্ত সত্য। বর্তমান যুগের জাতীয়তাবাদী চিন্তাশীল অনেকেই এমন ধারণা করে যে, আমরা যদি কাফির তথা ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, অগ্নিপূজক, ধর্ম বিদ্বেষী ও মুসলিম সবাই মিলে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা নিয়ে একই ব্যানারের অধীনে একতাবদ্ধ না হই তাহলে একদা শত্রু পক্ষ আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে, আমাদের সকল সম্পদ তারা ছিনিয়ে নিবে এবং আমাদের ওপরসমূহ বিপদ নেমে আসবে।

এ জন্যই তো দেখা যায়, যে কোনো ধর্ম, মত ও পন্থার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ উক্ত জাতীয়তাবাদের ব্যানারের অধীনে সবাই একে অপরের খাঁটি বন্ধু, অথচ এ চেতনা সরাসরি কুরআন ও শরী‘আত পরিপন্থী এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার দেওয়া সুস্পষ্ট সীমারেখার সরাসরি লঙ্ঘন। শরী‘আত বলে: ঈমানদার সে যে কোনো দেশ ও বর্ণের হোক

না কেন তাকে অবশ্যই ভালোবাসতে হবে এবং কাফির সে যে কোনো দেশ ও বর্ণের হোক না কেন তাকে অবশ্যই শত্রু ভাবতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١﴾ [الممتحنة: ١]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। উপরন্তু তারা রাসূল ও তোমাদেরকে নিজ এলাকা থেকে বের করে দিয়েছে এ কারণে যে, তোমরা নিজ প্রভুর ওপর ঈমান এনেছো। তোমরা যদি সত্যিই আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো এবং একমাত্র আমার সন্তুষ্টিই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা হলে আর এমন করতে যেয়ো না। আমি দেখছি, তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো, অথচ আমি তোমাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবই জানি। যে ব্যক্তি এমন করবে সে অবশ্যই সত্য পথভ্রষ্ট”। [সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত: ১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ

ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٢٢﴾ [المجادلة: ٢٢]

“তুমি আল্লাহ তা‘আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো সম্প্রদায়কে এমন পাবে না যে, তারা আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূলের প্রকাশ্য বিরোধীদেরকে ভালোবাসবে। যদিও তারা তাদের বাপ-দাদা, ছেলে-সন্তান, ভাই-বোন কিংবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হোক না কেন। এ জাতীয় মানুষদের অন্তরেই আল্লাহ তা‘আলা ঈমানকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন নিজ রহমত ও সাহায্য দিয়ে। আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে অনেকগুলো নদ-নদী। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও থাকবে তাঁর ওপর সর্বদা সন্তুষ্ট। এরাই হলো একান্ত আল্লাহর দল। আর আল্লাহর দলই তো হবে সর্বদা সফলকাম”। [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ২২]

তিনি আরো বলেন,

﴿قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ إِلَّا قَوۡلَ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسۡتَغۡفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمۡلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖۖ رَّبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَإِلَيۡكَ أَنَبۡنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٤﴾

[الممتحنة: ٤]

“তোমাদের জন্য ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলো: তোমরা এবং আল্লাহ তা‘আলার পরিবর্তে তোমরা যে মূর্তি সমূহের ইবাদাত করছো তা হতে আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পবিত্র। তোমাদেরকে আমরা এ মুহূর্তে বয়কট করছি এবং আজ হতে চিরকালের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে বলবৎ থাকবে শত্রুতা ও বিদ্বেষ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান আনো”। [সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত: ৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنٗا مُّبِينًا ١٤٤﴾ [النساء: ١٤٤]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদেরকে ছেড়ে কখনো কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি এরই মাধ্যমে নিজেদের শাস্তির জন্য আল্লাহ তা‘আলার হাতে কোনো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য তুলে দিতে চাও”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৪]

এ দিকে মুসলিমদের শত্রুর বিপক্ষে কাফির ও মুশরিকদের সহযোগিতা তাদের জন্য কখনোই নিরাপদ নয়। এ জন্যই তো আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে জনৈক মুশরিক বারবার তাঁর সহযোগিতা করতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেন নি

যতক্ষণ না সে মুসলিম হয়।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর অভিমুখে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে তিনি “ওয়াবারাহ” তথা বর্তমানের “হার্রাহ গারবিয়্যাহ” নামক এলাকায় পৌঁছুলে তাঁর নিকট জনৈক প্রসিদ্ধ বীর উপস্থিত হয়। যাকে দেখে সাহাবীয়ে কিরাম অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। উক্ত ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো: আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে এসেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি কি আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী? সে বললো: না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি চলে যাও। আমি কখনোই কোনো মুশরিকের সহযোগিতা নিতে পারি না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এ কথা শুনে লোকটি চলে গেলো। তিনি বলেন, যখন আমরা (সাহাবায়ে কিরাম) “শাজারাহ” নামক এলাকায় পৌঁছলাম তখন লোকটি আবারো এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একই প্রস্তাব করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাকে একই উত্তর দিলেন। এরপর লোকটি চলে গেলো। ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “বাইদা’” নামক এলাকায় পৌঁছলে লোকটি আবারো এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একই প্রস্তাব করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি কি আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী? সে

বললো: হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তাহলে তুমি আমাদের সাথে চলতে পারো।[53]

তাদেরকে আমরা কিভাবেই বা বিশ্বাস করবো, অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَآءُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَمَا تُخۡفِي صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ ١١٨﴾ [ال عمران: ١١٨]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে তথা মুসলিমদেরকে ছেড়ে অন্য কাউকে খাঁটি বন্ধু কিংবা পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ করো না। কারণ, তারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এতটুকুও সঙ্কোচবোধ করবে না। তোমাদের বিপর্যয়ই তাদের একান্ত কাম্য। ইদানিং তাদের মুখ থেকেই শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে। এ থেকে আন্দায করা যায়, তাদের অন্তরে লুকায়িত শত্রুতা আরো কতোই না ভয়ানক। আমি তোমাদের জন্য আমার সকল নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছি। যদি তোমরা সত্যিই বুদ্ধিমান হয়ে থাকো তা হলে তোমরা তা অবশ্যই বুঝবে"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৮]

কাফির ও মুশরিকরা কখনো মুসলিমদের পক্ষ হয়ে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও তা কখনোই মুসলিমদের জন্য সামগ্রিক অর্থে কোনো ধরনের কল্যাণই বয়ে আনবে না। উপরন্তু এ ব্যাপারে তাদের

---

[53] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮১৭।

কোনো ধরনের পরামর্শ গ্রহণ করলে তা একান্ত ক্ষতিরই কারণ হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمۡ عَلَىٰٓ أَعۡقَـٰبِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَـٰسِرِينَ ١٤٩﴾ [ال عمران: ١٤٩] ﴿بَلِ ٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلنَّـٰصِرِينَ ١٥٠﴾ [ال عمران: ١٥٠]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফিরদের আনুগত্য করো তা হলে তারা তোমাদেরকে অবশ্যই পেছনের দিকে ফিরিয়ে নিবে। তখন তোমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং আল্লাহ তা‘আলাই তোমাদের একমাত্র অভিভাবক এবং তিনিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী”।

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৯-১৫০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالٗا وَلَأَوۡضَعُواْ خِلَـٰلَكُمۡ يَبۡغُونَكُمُ ٱلۡفِتۡنَةَ وَفِيكُمۡ سَمَّـٰعُونَ لَهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٧﴾ [التوبة: ٤٧]

“যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তা হলে তারা তোমাদের কোনো লাভ তো করতোই না বরং তারা তোমাদের মাঝে আরো ফাসাদ বাড়িয়ে দিতো। আর এ ব্যাপারে তারা এতটুকুও ত্রুটি করতো না। তারা তো তোমাদের মাঝে সর্বদা ফিতনাই কামনা করে। উপরন্তু তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের বহু গোয়েন্দা। মূলতঃ আল্লাহ তা‘আলা এ জাতীয় যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪৭]

বস্তুতঃ মুমিন মুমিনেরই বন্ধু এবং কাফির কাফিরেরই বন্ধু। কাফির কখনো মুমিনের বন্ধু হতে পারে না। কুরআন নির্দেশিত উক্ত নিয়ম ভঙ্গ করলে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই হবে না। উপরন্তু এ জাতীয় মু'মিনরা আল্লাহ তা'আলার রহমত বঞ্চিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ [التوبة: ٧١]

"মুমিন পুরুষ ও নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা একে অপরকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করবে। এঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতিশয় পরাক্রমশালী অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ إِلَّا تَفۡعَلُوهُ تَكُن فِتۡنَةٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَفَسَادٞ كَبِيرٞ ٧٣﴾ [الانفال: ٧٣]

"এ দিকে কাফিররা একে অপরের বন্ধু। তোমরা যদি উপরোক্ত শত্রুতা ও মিত্রতার বিধান কার্যকর না করো, তাহলে এ পৃথিবীতে কঠিন ফিতনা ও মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে"। [সূরা আনফাল, আয়াত: ৭৩]

বর্তমান বিশ্বে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া উক্ত বিধান কার্যকর না হওয়ার দরুনই আজ দেখা যাচ্ছে হরেক রকমের ফিতনা-ফাসাদ ও রং বেরংয়ের মহা বিপর্যয়। মুসলিমদের মধ্যেই আজ দেখা যাচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে প্রচুর সন্দেহ-সংশয়। আজ তারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। উপরন্তু তারা দিনদিন বাতিল ও বাতিলপন্থীদের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। আরো কতো কি।

এ যুগে নামধারী আলিমদেরকে কিনতে পাওয়া যায়। তাই আজ বাতিল পন্থীরা এদের মাধ্যমে নিজেদের বাতিলকে সমাজে সহজভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুরআন ও হাদীসের ঠুনকো লেবেল লাগানোয় ব্যস্ত। এ জন্যই দেখতে পাবেন, আজ দুনিয়ার বুকে এমন কোনো বাতিল পন্থী নেই যাদের সাথে নামধারী কোনো না কোনো আলিম সম্পৃক্ত নয়। তাই আলিম নামধারী কোনো না কোনো ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত থেকে খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের বৈধতা খোঁজার চেষ্টা করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ٨٢﴾ [المائدة: ٨٢]

"তুমি দুনিয়ার মানুষদের মাঝে মুমিনদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরকে। আর মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী পাবে ওদেরকে যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে দাবি করে। আর তা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে

কিছু জ্ঞানপিপাসু ও সংসারত্যাগী এবং তারা অহঙ্কারীও নয়”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮২]

তারা বলতে পারে, উক্ত আয়াত খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব জায়িয হওয়া প্রমাণ করে।

মনে রাখতে হবে, কোনো আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া জাহান্নামী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই উক্ত আয়াতকে অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের সাথে মিলালে যে মর্ম উদঘটিত হয় তা হচ্ছে, খ্রিস্টানদের কেউ কেউ উন্মুক্ত পড়াশুনা, নম্রতা ও সংসারত্যাগী স্বভাব ও মনোভাবের দরুন খাঁটি ঈমানদার ও মুসলিমদের উন্নত চরিত্র তথা মানবতাবোধে অভিভূত হয়ে তাদের সাথে সখ্যতা গড়ার নিকটবর্তী হতে পারে। যা ইয়াহূদী ও মুশরিকদের থেকে কখনোই কল্পনা করা যায় না। উক্ত আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, খ্রিস্টানরা মুমিনদের বন্ধু হয়ে যাবে, না মুমিনগণ খ্রিস্টানদের বন্ধু হবে। এমনকি যদিও ধরা হয় যে, খ্রিস্টানদের কেউ মুমিনদেরকে ভালোবাসলো কিংবা তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলো তারপরও কোনো মু'মিনের জন্য জায়িয হবে না তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো। যা অন্যান্য আয়াত কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

তেমনিভাবে কোনো না কোনো ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের বৈধতা খোঁজার চেষ্টা করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن

﴿تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨﴾ [الممتحنة: ٨]

“দীন নিয়ে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদেরকে নিজ এলাকা থেকে বের করে দেয় নি তাদের প্রতি দয়া ও ইনসাফের আচরণ করতে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন নি। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন”। [সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত: ৮]

তারা বলতে পারে, উক্ত আয়াত তাতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব জায়িয হওয়া প্রমাণ করে।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা‘আলারসমূহ বাণী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরসমূহ বিশুদ্ধ হাদীস মিলেই তো ইসলামী শরী‘আত। তাই যে কোনো বিষয়ে শরী‘আতের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিকোণ জানার জন্য সে বিষয়ে নাযিলকৃত আল্লাহ তা‘আলারসমূহ বাণী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরসমূহ বিশুদ্ধ হাদীস পরস্পর মিলিয়ে দেখতে হবে। সুতরাং উক্ত আয়াতকে অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের সাথে মিলালে যে মর্ম উদঘটিত হয় তা হচ্ছে, কাফিররা মুসলিমদের সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হলে অথবা মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের কোনো ধরণের নিরাপত্তা দেওয়া হলে কিংবা তাদেরকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে শর্তসাপেক্ষ বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হলে মুসলিমরা তাদের সাথে দয়া ও ইনসাফের আচরণ করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। আস্মা’ বিন্ত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় একদা আমার আম্মাজান মুশরিক থাকাবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে আমি এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমার মা তো ঈমানদার নন, অথচ তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন দুনিয়ার কোনো সুবিধা হাসিলের জন্য। এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সুলভ আচরণ করতে পারি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তুমি তোমার মায়ের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সুলভ আচরণ করতে পারো।[54]

একদা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীর গেইটে একটি সিল্কের পোশাক বিক্রি হতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এ পোশাকটি কিনে জুমার দিন কিংবা বাইরের কোনো প্রতিনিধি দল আপনার নিকট আসলে তাদের সামনে তা পরে বেরুতেন তাহলে আপনাকে খুবই সুন্দর লাগতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এ জাতীয় পোশাক এমন লোকরাই পরে যাদের আখিরাতে কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছে নেই তথা কাফির-মুশরিক। কিছু দিন পর এ জাতীয় কিছু পোশাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি তার একটি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কে দান করলেন। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে এ জাতীয় পোশাক পরাতে

[54] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০০৩।

চাচ্ছেন, অথচ আপনি এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে যা বলার বলেছেন তথা তা পরা হারাম করে দিয়েছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তো তোমাকে তা পরতে দেইনি। অতএব, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত পোশাকটি মক্কায় বসবাসরত তার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন।[55]

বরং কাফিরদের সাথে এ জাতীয় দয়াময় আচরণ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করবে। উপরন্তু তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা পাবে এবং তাদের মধ্যকার গরিব-দুঃখীদের প্রয়োজনও পূরণ হবে। তবে তা কখনোই তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা বুঝায় না।

৪. জাতীয়তাবাদী চেতনা শরী'আত বিরোধী হওয়ার আরেকটি মূল কারণ হচ্ছে, এ জাতীয় চেতনা কুরআনের আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে। কারণ, কোনো জাতীয়তাবাদী হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান কখনো নিজেদের রাষ্ট্রে ইসলামী আইন বাস্তবায়নে রাজি হবে না। তখন বাধ্য হয়ে উক্ত জাতীয়তাবাদী সরকার সবাইকে খুশি রাখার জন্য নিজেদের মানব রচিত বিধানের আলোকেই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। আর মানব রচিত বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা করা মূলতঃ কুফুরীই বটে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ

[55] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৮।

حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

“অতএব, আপনার রবের কসম! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক বানিয়ে নেয় এবং আপনার সকল ফায়সালা নিঃসঙ্কোচে তথা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠﴾ [المائدة: ٥٠]

“তারা কি জাহেলী যুগের বিধান চাচ্ছে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার বিধান চাইতে সুন্দর বিধান আর কে দিতে পারে”? [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫০]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করে না সে তো কাফির”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য

পরিচালনা করে না সে তো যালিম”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করে না সে তো ফাসিক”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৭]

সুতরাং যে রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি আল্লাহ তা‘আলার বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করে না এবং তা পছন্দও করে না সে রাষ্ট্র কাফির, যালিম ও ফাসিক রাষ্ট্র হিসেবেই বিবেচিত হবে। প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই কর্তব্য হবে এ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রশাসনের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। উপরন্তু এ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রশাসনের সাথে বন্ধুত্ব করা হারাম যতক্ষণ না তারা আল্লাহ তা‘আলার বিধান বাস্তবায়ন করবে ও তার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ إِلَّا قَوۡلَ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسۡتَغۡفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمۡلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖۖ رَّبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَإِلَيۡكَ أَنَبۡنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٤﴾ [الممتحنة: ٤]

“তোমাদের জন্য ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও তাঁর অনুসারীদের

মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলোঃ তোমরা এবং আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে তোমরা যে মূর্তি সমূহের ইবাদাত করছো তা হতে আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তোমাদেরকে আমরা অস্বীকার করছি এবং আজ হতে চিরকালের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে বলবৎ থাকবে শত্রুতা ও বিদ্বেষ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনবে"। [সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৪]

কেউ বলতে পারে, আমরা যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলিমের মাঝে কোনো ধরনের ব্যবধান সৃষ্টি না করে শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদের ব্যানারে সবাই একত্রিত হই তা হলে আমরা একদা এক অভূতপূর্ব শক্তিতে রূপান্তরিত হবো। তখন সবাই আমাদেরকে এক বাক্যে ভয় পাবে এবং আমাদের হৃতসমূহ অধিকার তারা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে।

কেউ আরো বলতে পারে, আমরা যদি সত্যিকারার্থে শুধুমাত্র ইসলামকেই আকড়িয়ে ধরি এবং এরই ব্যানারে সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হই তাহলে কাফিররা একদা আমাদের প্রতি যথেষ্ট শত্রুতা পোষণ করবে এবং তারা সর্বদা আমাদের জন্য অকল্যাণই ডেকে আনবে। কারণ, তখন তারা এ কথা ভেবে অবশ্যই ভয় পাবে যে, একদা হয়তো-বা আমরা তাদের সাথে ধর্মীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বো যাতে করে আমরা আমাদের সেই পূর্ব ঐতিহ্য ফিরিয়ে পেতে পারি।

মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই যদি নিরেট ইসলাম ও কুর'আনের ব্যানারে একতাবদ্ধ হই এবং আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান এ জমিনের বুকে বাস্তবায়ন করি উপরন্তু কাফিরদের থেকে একেবারে ভিন্ন

হয়ে তাদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা ঘোষণা দিয়ে নিজেদের স্বকীয় অস্তিত্ব দেখাতে পারি তা হলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। তখন তিনি আমাদেরকে তাদের সকল ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের অন্তরে আমাদের প্রতি প্রচুর ভয় ঢুকিয়ে দিবেন। আর তখন তারা অবশ্যই আমাদেরকে ভয় করবে এবং আমাদের সকল অধিকার পূর্ণাঙ্গরূপে ফিরিয়ে দিবে যেমনিভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলো সে যুগের কাফিররা আমাদের পূর্ব পুরুষ মুসলিমদেরকে। সে যুগে দুনিয়ার বুকে ইয়াহূদী-খ্রিস্টান কম ছিলো না। তবে তখন মুসলিমরা কখনোই তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতায়নি এবং নিজেদের যে কোনো ব্যাপারে তাদের কোনো সহযোগিতা কামনা করেনি। বরং তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছিলো এবং সর্ব ব্যাপারে তাঁরই সাহায্য কামনা করেছিলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে শত্রুর ওপর জয়ী করেছেন। কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ইতিহাস এর চাক্ষুষ প্রমাণ, যা মুসলিম এবং কাফির সবাই স্বীকার করতে বাধ্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিনে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে বের হয়েছেন। মদীনায় তখন অনেক ইয়াহূদী ছিলো। কিন্তু তিনি তখন তাদের কারোর সহযোগিতা নেননি, অথচ তখন মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম ছিলো এবং অন্যের সহযোগিতা নেওয়ারও তখন বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। তবুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সহযোগিতা নেন নি। এমনকি তিনি উ'হুদের যুদ্ধেও ইয়াহূদীদের কোনো সহযোগিতা নেন নি, অথচ তখন মুনাফিকদের সর্দারের পক্ষ

থেকে তাদের সহযোগিতা নেওয়ার বিশেষ প্রস্তাব এসেছিলো; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমদের জন্য কোনো কাফিরের সহযোগিতা নেওয়া ঠিক নয় এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদেরকে মুসলিম সেনা বাহিনীতে জায়গা দেওয়াও জায়িয নয়। কারণ, তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া নিশ্চিত নয়। বরং তারা যে কোনো সূত্রে মুসলিমদের সাথে মিশে গেলে মারাত্মক ফাসাদ সৃষ্টি হবে। মুসলিমদের চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং কাফিররা মুসলিমদের মাঝে ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করারও সুযোগ পাবে। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের নিয়মে চলা নিজেদের জন্য লাভজনক মনে করে না সত্যিকারার্থে অন্য কোনো পদ্ধতি তাদেরকে কোনো ধরণের লাভই দিতে পারবে না।

এ দিকে সকল মুসলিম শুধুমাত্র ইসলামের ব্যানারেই সঙ্ঘবদ্ধ হলে কাফিররা যে তাদের সাথে কঠিন বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করবে তা স্বাভাবিক যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এবং এরই ভিত্তিতে তিনি তাদেরকে সহযোগিতা করবেন। কারণ, মুসলিমরা কাফিরদেরকে শত্রু বানিয়েছে তো একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য এবং তাঁরই দীন ও শরী'আতকে রক্ষা ও দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করার জন্য।

মনে রাখতে হবে, কাফিররা কখনোই মুসলিমদের সাথে তাদের শত্রুতা বন্ধ করবে না যতক্ষণ না মুসলিমরা তাদের মতোই কাফির হয়ে যায় এবং তাদের দলে যোগ দেয়। আর কোনো মুসলিমের এমন পথ

অবলম্বন করা মহা ভ্রষ্টতা ও প্রকাশ্য কুফুরী বৈ কি। তেমনিভাবে তা দুনিয়া ও আখিরাতে সকল শাস্তি ও দুর্ভোগের কারণ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ ١٢٠﴾ [البقرة: ١٢٠]

“ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা কখনোই তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ করবে। তুমি মুসলিমদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তা‘আলার নাযিলকৃত হিদায়াতই সঠিক হিদায়াত। তুমি যদি তোমার নিকট আসা সত্য জ্ঞানের অনুসারী না হয়ে তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো তা হলে তুমি নিজকে আল্লাহ তা‘আলার আযাব থেকে রক্ষা করার মতো কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে পাবে না”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمۡ عَن دِينِكُمۡ إِنِ ٱسۡتَطَٰعُواْۚ وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧]

“তারা কখনোই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা বন্ধ করবে না যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে ধর্মচ্যুত করতে পারে। যদি তাদের পক্ষে তা করা সম্ভবপর হয়। তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মচ্যুত হয়ে কাফির অবস্থায় মারা

যাবে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সকল আমল নিষ্ফল বলে গণ্য হবে। উপরন্তু তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٨ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۝١٩﴾ [الجاثية: ١٨- ١٩]

“আমরা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি সুস্পষ্ট একটি শর‘ঈ বিধানের ওপর। সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ করবে। কখনো মূর্খদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। কারণ, তারা কখনোই তোমাকে আল্লাহ তা‘আলার আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। বরং যালিমরা একে অপরের বন্ধু। তবে আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র আল্লাহভীরুদেরই বন্ধু”। [সূরা আল-জাসিয়াহ, আয়াত: ১৮-১৯]

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে এ জাতীয়তাবাদী চেতনার মহামারী থেকে রক্ষা করুন। আমীন। সুম্মা আমীন।

أهمية الجار وحقوقه

প্রতিবেশীর গুরুত্ব ও অধিকার

মানুষ বলতেই এ দুনিয়াতে কেউ একাকী বসবাস করতে পারে না। তাই আমাদের সকলকেই মানুষ হিসেবে নিজ সামাজিক জীবনে একে অপরের সাথে মিলেমিশেই থাকতে হয়। এই সুবাদে সমাজের ধনী ও শক্তিশালীরা গরিব ও দুর্বলদের অধিকার নষ্ট করতেই পারে। তেমনিভাবে সমাজের গরীব ও দুর্বলরা সমাজের শক্তিশালী শ্রেণী কর্তৃক নির্যাতিত এবং নিপীড়িতও হতে পারে। তাই ইসলামী শরী'আত সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট অধিকার চিহ্নিত করেছে যা কারো কর্তৃক দলিত হলে যে কোনো যুগের ইসলামী প্রশাসন কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তা উদ্ধার করতে বাধ্য থাকবে।

প্রতিবেশী বলতে এমন সকল ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যিনি বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মক্ষেত্রের দরুন আপনার পাশেই অবস্থান করছেন।

প্রতিবেশী আবার তিন প্রকার:

ক) যে কোনো মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী। যে ব্যক্তি ইসলাম, আত্মীয়তার বন্ধন ও প্রতিবেশী হওয়ার দরুন আপনার কাছ থেকে সর্বমোট তিনটি অধিকার পাবে। মুসলিম, আত্মীয় ও প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার।

খ) যে কোনো মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী। যে ব্যক্তি ইসলাম ও প্রতিবেশী হওয়ার দরুন আপনার কাছ থেকে সর্বমোট দু'টি অধিকার পাবে। মুসলিম ও প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার।

গ) যে কোনো অমুসলিম কাফির প্রতিবেশী। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র প্রতিবেশী হওয়ার দরুন আপনার কাছ থেকে একটিমাত্র অধিকার পাবে। শুধু প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার।

ইসলামে প্রতিবেশীর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. আল্লাহ তা'আলা প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি সযত্ন হতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦﴾ [النساء: ٣٦]

"তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। আরো ভালো ব্যবহার করো আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সাথি কিংবা সফরসঙ্গী, পথিক ও গোলাম অথবা অধিনস্থ কাজের লোকের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অহঙ্কারী আত্মাভিমানীকে ভালোবাসেন না"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬]

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»

“জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম বারবার আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি যত্নবান হতে অসিয়ত করছিলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিলো তিনি প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন”।[56]

২. প্রতিবেশীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা জাহেলী যুগের অভ্যাস যা পরিবর্তনের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। এ ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে জানা যায় হযরত জাফর ইবন আবু তালিবের বর্ণনা থেকে যখন তিনি সম্রাট নাজ্জাশীর সামনে তখনকার যুগের নব ধর্ম তথা ইসলামের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন,

«أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْـلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْـمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنَّا نَعْـرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ، وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْـحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْـمُحْصَنَةِ»

“হে রাষ্ট্রপতি! আমরা তো ছিলাম একদা জাহিল সম্প্রদায়। মূর্তি পূজা করতাম। মৃত পশু খেতাম। সর্ব প্রকার অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিলাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীদের সাথে দুর্ব্যবহার করতাম। আমাদের মধ্যকার শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলের অধিকার হরণ করতো।

[56] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৫।

আমরা এমতাবস্থায় ছিলাম। একদা আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তিকে রাসূল হিসেবে পাঠিছেন যার বংশ, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও সাধুতা সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বেই অবগত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকলেন তাঁর একক ইবাদত ও তিনি ভিন্ন অন্য যে পাথর ও মূর্তির ইবাদত আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা করতাম তা পরিহার করতে। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলা, আমানতদারিতা ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, হারাম কাজ ও রক্তপাত বন্ধ করতে আদেশ করেন এবং অশ্লীলতা, মিথ্যা কথা, এতিমের সম্পদ খাওয়া ও সতী-সাধ্বী মহিলাকে অপবাদ দিতে নিষেধ করেন"।[57]

৩. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও তার অধিকার রক্ষা করলে যেমন প্রতিবেশীর নিকট শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকটও। আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ»

"কেউ তার সাথির নিকট শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হলে আল্লাহ তা'আলার নিকটও সে একজন শ্রেষ্ঠ সাথীরূপে বিবেচিত। আর কেউ তার প্রতিবেশীর

[57] আহমাদ, হাদীস নং ১৭৪০।

নিকট শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হলে আল্লাহ তা‘আলার নিকটও সে একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী”।[58]

৪. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও তার অধিকার রক্ষা করা গুনাহ মাফের একটি বিশেষ মাধ্যম।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ রবের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، يَشْهَدُ لَهُ ثَلاَثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ، إِلاَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ»

“কোনো মুসলিম মারা গেলে তার নিকটতম প্রতিবেশী তিনটি ঘর যদি তার ব্যাপারে সত্যিকারার্থে ভালো হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তাহলে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি লোকটি সম্পর্কে তার দৃশ্যমান ব্যাপারসমূহে আমার বান্দার সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম। আর তার অদৃশ্যমান ব্যাপারসমূহ আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। যা একমাত্র আমিই জানি। আর কেউ জানে না”।[59]

৫. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও তার অধিকার রক্ষা করলে দুনিয়াতে মানুষের ভূয়সী প্রশংসা পাওয়া যায়। আর এর বিপরীতে পাওয়া যায় সমূহ লাঞ্ছনা ও তিরস্কার।

---

[58] তিরমিযী, হাদীস ১৯৪৪।

[59] আহমাদ, হাদীস ৮৯৭৭।

স্বনামধন্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক রহ. বলেন, একদা হাসসান ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু এক আরব গোত্রের নিন্দা করতে গিয়ে বলেন। যারা একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবীগণকে 'রাজী' নামক কূপ এলাকায় হত্যা করেছিলো। তিনি বলেন,

إنْ سَرّكَ الْغَدْرُ صِرْفًا لَا مِزَاجَ لَهُ فَأْتِ الرَّجِيعَ فَسَلْ عَنْ دَارِ لِحْيَانَ
قَوْمٌ تَوَاصَوْا بِأَكْلِ الْجَارِ بَيْنَهُمْ فَالْكَلْبُ وَالْقِرْدُ وَالْإِنْسَانُ مِثْلَانِ
لَوْ يَنْطِقُ التّيْسُ يَوْمًا قَامَ يَخْطُبُهُمْ وَكَانَ ذَا شَرَفٍ فِيهِمْ وَذَا شَأْنِ

"তোমার যদি মনে চায় কারোর নিরেট গাদ্দারি সম্পর্কে জানতে তা হলে তুমি রাজী' নামক কূপ এলাকায় গিয়ে বনী লেহইয়ান সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তখন তুমি জানতে পারবে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা প্রতিবেশীর অধিকার আত্মসাৎ করে। এমনকি কুকুর, বানর ও মানুষ সবই তাদের নিকট সম-মর্যাদার। কখনো কোনো ছাগল কথা বলতে পারলে সেই তাদের মাঝে বক্তা হিসেবে খ্যাতি পাবে। উপরন্তু সে ছাগলই হবে তাদের মধ্যকার একজন সম্মানী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি"।[60]

৬. প্রতিবেশীর সাথে কোনো দোষ করা অত্যন্ত ভয়ানক অন্যান্যর সাথে একই দোষ করার চাইতে।

[60] আর-রাওযুল-উনফ ৩/৩৭৪।

মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল নিজ সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

«مَا تَقُولُوْنَ فِيْ الزِّنَا ؟ قَالُوْا: حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لِأَصْحَابِهِ: لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، قَالَ: فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِيْ السَّرِقَةِ ؟ قَالُوْا: حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ، قَالَ: لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ»

“তোমরা ব্যভিচার সম্পর্কে কি বলো? সাহাবীগণ বললেন: আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল তা হারাম করে দিয়েছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অত্যন্ত ভয়ানক অন্য দশটি মহিলার সাথে ব্যভিচার করার চাইতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, তোমরা চুরি সম্পর্কে কি বলো? সাহাবীগণ বললেন: আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল তা হারাম করে দিয়েছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিজ প্রতিবেশীর ঘর থেকে চুরি করা অত্যন্ত ভয়ানক অন্য দশটি ঘর থেকে চুরি করার চাইতে”।[61]

৭. কারোর প্রতিবেশী নেককার হওয়া তার মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এর বিপরীতে কারোর প্রতিবেশী বদকার হওয়া তার মহা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

[61] আহমাদ, হাদীস নং ২৩৯০৫।

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الـمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالـمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْـجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الـهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْـجَارُ السُّوءُ، وَالْـمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْـمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالـمَرْكَبُ السُّوءُ»

"চারটি জিনিস সৌভাগ্যের: নেককার স্ত্রী, প্রশস্ত ঘর, নেককার প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন। আর চারটি জিনিস হচ্ছে দুর্ভাগ্যের: বদকার প্রতিবেশী, বদকার স্ত্রী, সংকীর্ণ ঘর ও আরামহীন বাহন"।[62]

উপরোক্ত বিষয়সমূহ থেকে শরী'আতে প্রতিবেশীর প্রতি গুরুত্বের ব্যাপারটি সবার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবার আমাদের জানতে হবে যে, শরী'আত প্রতিবেশীকে এমন কিছু অধিকার দিয়েছে যার প্রতি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সচেতন হলে সমাজে পরস্পর প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। উপরন্তু সে সমাজ হবে ইসলামের দৃষ্টিতে একটি আদর্শ সমাজ। নিম্নে প্রতিবেশীর অধিকারগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত হলো।

১. প্রতিবেশীকে যে কোনোভাবে কষ্ট না দেওয়া। এটি একজন প্রতিবেশীর একান্ত প্রাপ্য। সুতরাং কেউ ঈমানের দাবি করে নিজ প্রতিবেশীকে যে কোনোভাবে কষ্ট দিতে পারে না।

---

[62] ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৪০৩২।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ»

"কেউ আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করলে সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়"।[63]

উপরন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلاَتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ، وَلاَ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: هِيَ فِي الْـجَنَّةِ»

"জনৈক ব্যক্তি একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! জনৈকা মহিলা বেশি বেশি নফল সালাত, নফল সাওম ও নফল সাদাকা করে, অথচ সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সে জাহান্নামী। লোকটি আবারো বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! জনৈকা মহিলা খুব কমই নফল সালাত, নফল সাওম ও নফল সাদাকা করে, সে কিছু পনিরের টুকরো সাদাকা করে। তবে সে নিজ মুখ দিয়ে কোনো

[63] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সে জান্নাতী”।[64]

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া অনেকভাবেই হতে পারে। তার প্রতি হিংসা করা, তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও তাকে নিচু মনে করা, তার লুক্কায়িত ব্যাপারগুলো জন সমক্ষে প্রচার করা, তার ব্যাপারে মিথ্যা বলা, তার থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, তার ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করা, তার দোষে খুশি হওয়া, তাকে নিজ বাসস্থানে ও গাড়ি রাখার জায়গায় কোণঠাসা করা। তার ঘরের দরজায় ময়লা ফেলা, তার ঘরের মহিলাদের দিকে উঁকি মেরে তাকানো, বড় বা বিশ্রী আওয়াজ দিয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া। এমনকি তার সন্তানের ব্যাপারে তাকে কষ্ট দেওয়া।

কেউ নিজ প্রতিবেশী কর্তৃক কষ্ট পেলে ধৈর্য ধরবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার প্রতিবেশীর ব্যাপারে তাকে কষ্ট দেওয়ার অভিযোগ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: চলে যাও। ধৈর্য ধরো। লোকটি আবারো দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এসে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: চলে যাও। নিজের ঘরের সামানগুলো রাস্তায় বের করো। লোকটি তাই করলে মানুষ তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে তার প্রতিবেশীর কষ্ট দেওয়ার

---

64 আহমাদ, হাদীস ৯৬৭৩

ব্যাপারটি সবাইকে জানালে সবাই তাকে লা'নত তথা অভিসম্পাত দিতে শুরু করে। তারা বলতে থাকেঃ আল্লাহ তা'আলা তার এ ক্ষতি করুক, ও ক্ষতি করুক। অতঃপর তার প্রতিবেশী তার কাছে এসে বললো: তুমি ঘরে ফিরে যাও। বাকি জীবন তুমি আমার পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখবে না যাতে তুমি মনে কষ্ট পাও।[65]

২. প্রতিবেশীকে মাঝে মধ্যে কোনো কিছু হাদিয়া তথা উপঢৌকন দেওয়া। কারণ, হাদিয়া হচ্ছে ভালোবাসার প্রমাণ। এর মাধ্যমে মানুষে মানুষে দূরত্ব কমে যায় এবং পরস্পর সম্প্রীতি ফিরে আসে।

আবু শুরাইহ আদাওয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَه»

“যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে”।[66]

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

«يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ»

---

[65] আবু দাউদ, হাদীস ৫১৫৩।

[66] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮।

“হে আবু যর! যখন তুমি ঝোল জাতীয় কোনো কিছু পাকাবে তখন তাতে পানি একটু বেশী করে দিবে এবং নিজ প্রতিবেশীদের একটু খবরাখবর নিবে তথা তাদেরকে তা থেকে সামান্য কিছু হলেও দিবে”।[67]

অতঃপর আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে একদা একটি ছাগল যবাই করা হয়েছিলো। ঘরে এসে তিনি যখন তা জানতে পারলেন তখন তিনি নিজ ঘরের লোকদেরকে বললেন: তোমরা কি আমাদের ইয়াহূদী প্রতিবেশীকে তা থেকে কিছু হাদিয়া দিয়েছিলে? তোমরা কি আমাদের ইয়াহূদী প্রতিবেশীকে তা থেকে কিছু হাদিয়া দিয়েছিলে? আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,

«مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»

“জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম বারবার আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি যত্নবান হতে অসিয়ত করছিলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিলো তিনি প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন”।[68]

সকল প্রতিবেশীকে সর্বদা হাদিয়া দেওয়া সম্ভব না হলে নিজের নিকটতম প্রতিবেশীকেই হাদিয়া দিবে।

---

[67] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৫।

[68] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৫।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: আমার তো দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে জিনিস কম হলে আমি তাদের কাকে সর্বপ্রথম হাদিয়া দেবো? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا»

"তাদের মধ্যে যার ঘরের দরজা তোমার সব চাইতে নিকটে"।[69]

হাদিয়া শুধু ফকীর প্রতিবেশীকেই দিবে তা নয়। বরং ধনী-গরিব সকল প্রতিবেশীকেই হাদিয়া দিবে।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দিতেন, অথচ তিনি চাইলে আল্লাহ তা'আলা উহুদ পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দিবেন বলে একদা প্রস্তাব করেছেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সুযোগ পেলেই সাহাবীগণকে হাদিয়া দিতেন তেমনিভাবে তারাও তাঁকে হাদিয়া দিতেন। এমনকি হাদিয়ার ওপর নির্ভর করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ মাসের পর মাস অতিবাহিত করতেন।

একদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার ভাগ্নে উরওয়াহ রহ.-কে বললেন:

«وَاللَّهِ يَا ابْنَ أُخْتِيْ! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِيْ

[69] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৫৯।

شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِيْ أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ نَارٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ ؟! قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْـمَاءُ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِمِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَاهُ»

"আল্লাহ তা'আলার কসম! হে আমার ভাগ্নে! আমরা চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এমনকি আমরা দু' চান্দ্রমাস পেরিয়ে তৃতীয় মাসে উপনীত হতাম, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো স্ত্রীর ঘরেই চুলায় আগুন জ্বলতো না তথা খানা পাকানো হতো না। উরওয়াহ বলেন, আমি বললাম: হে আমার খালা! তখন আপনারা কি খেয়ে জীবন যাপন করতেন। তিনি বললেন: দু'টি কালো জিনিস খেয়ে। তার একটি হলো খেজুর। আর অপরটি পানি। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। যাদের ছিলো কিছু দুগ্ধবতী ছাগল। তারা মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ছাগলের দুধ পাঠাতেন। আর তা আমরা পান করতাম"।[70]

এটিই হচ্ছে প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেওয়ার সুন্নাত। তা না হলে একদা আপনার প্রতিবেশীই কিয়ামতের দিন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিচারের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[70] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৬৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৭২।

«كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِيْ، فَمَنَعَ مَعْرُوفَهُ»

"বহু প্রতিবেশী তো এমন রয়েছে যারা নিজ প্রতিবেশীকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে ধরে বলবে, হে আমার রব! এ লোকটি আমার চোখের সামনে তার বাড়ির গেইটটি বন্ধ করে দিলো। সে আমাকে এতটুকুও দয়া করে নি। সে আমাকে কিছুই দেয় নি"।[71]

৩. নিজের জন্য যা ভালোবাসবে নিজ প্রতিবেশীর জন্যও তা ভালোবাসবে। সর্বদা তার কল্যাণ কামনা করবে। তাকে কোনো ভাবেই হিংসা করবে না।

আনাস্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

"সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন তথা আল্লাহ তা'আলার কসম! কোনো বান্দা সত্যিকারার্থে মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার প্রতিবেশী কিংবা যে কোনো মুসলিম ভাইয়ের জন্য তা ভালোবাসবে যা নিজের জন্য সে ভালোবাসে"।[72]

৪. যথাসাধ্য নিজ প্রতিবেশীর পার্থিব যে কোনো প্রয়োজন পূরণে তাকে

---

[71] সহীহ বুখারী, আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস নং ১১১।

[72] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫।

সহযোগিতা করবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: مَا لِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللّٰهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ»

"তোমাদের কেউ তার প্রতিবেশীকে তার নিজ দেওয়ালে প্রয়োজনে কোনো কাঠের টুকরো গাড়তে চাইলে তাকে তাতে কোনো বাধা দিবে না। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি কেন তোমাদেরকে এ কাজে অনীহা প্রকাশ করতে দেখছি? আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই কাঠের টুকরোগুলো তোমাদের কাঁধে নিক্ষেপ করবো"।[73]

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নিজ প্রতিবেশীর সহযোগিতার ব্যাপারে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার দরুন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ভূয়সী প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি একদা আশআরী গোত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বলেন,

«إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ

---

[73] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬০৯।

عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ»

“আশআরী গোত্রের লোকদের এমন সুন্দর অভ্যাস যে, তারা যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের নিজেদের মধ্যকার খাদ্য দ্রব্য শেষ হওয়ার উপক্রম হলে অথবা মদীনায় তাদের পরিবারবর্গের খাদ্য দ্রব্য কমে গেলে তারা নিজেদের নিকট মজুদ থাকা সকল খাদ্য দ্রব্য একটি কাপড় বা চাদরে একত্রিত করে কোনো বাটি বা পাত্র দিয়ে নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। তারা আমার এবং আমিও তাদেরই একজন”।[74]

৫. নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রী, সন্তান ও সম্মানের হিফাযত করবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يَدْخُلُ الْـجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

“সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবেনা যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়”।[75]

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম: কোনো গুনাহ আল্লাহ তা‘আলার নিকট সব চাইতে বেশি মারাত্মক? তিনি বললেন:

---

[74] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫০০।

[75] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬।

«أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»

“কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলার সমকক্ষ বা শরীক বানানো; অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম: অতঃপর কি? তিনি বললেন: নিজ সন্তানকে হত্যা করা তোমার সাথে খাবে বলে। আমি বললাম: তারপর কি? তিনি বললেন: নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা”।[76]

৬. নিজ প্রতিবেশীর দুঃখে দুঃখী হবে এবং তাকে কোনোভাবেই চিন্তিত ও ব্যথিত করবে না। বিশেষ করে প্রতিবেশীটি বেশি বয়স্ক হলে।

ইমাম যাহাবী বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন হামিদ বায্যার থেকে শুনেছি তিনি বলেন, আমরা একদা আবু হামিদ আমাশীকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমি বললাম: আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন: আমি তো ভালোই আছি। তবে আমার প্রতিবেশী আবু হামিদ জালূদী আমাকে চিন্তিত করেছে। সে গতকাল আমার সাক্ষাতে আসলো। তখন আমি আরো বেশি অসুস্থ ছিলাম। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো: হে আবু হামিদ! আমি খবর পেয়েছি “যানজাওয়াই” মারা গেছে। আমি বললাম: আল্লাহ তা‘আলা তাকে দয়া করুন। সে আবারো বললো: আমি আজ “মুআম্মিল্ ইবন হাসানের নিকট গিয়েছিলাম। তখন সে তার

[76] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৬।

শেষ নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগ করছিলো। সে আবারো বললো: হে আবু হামিদ! আপনার বয়স কতো? আমি বললাম: আমার বয়স ৮৬ বছর। তখন সে বললো: তাহলে আপনি আপনার পিতার চাইতেও বেশি বয়স পেয়েছেন। আমি বললাম: আমি তো আল-'হামদুলিল্লাহ সুস্থই আছি। আমি তো গত রাত এ এ কাজ করেছি। আজও এ এ কাজ করেছি। তখন সে লজ্জিত হয়ে চলে গেলো।[77]

আমরা আজ থেকে চেষ্টা করবো আমাদের প্রতিবেশীর প্রতিটি অধিকার আদায় করতে এবং তার সাথে থাকা পূর্বেকার সকল হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে যেতে। আর সব সময় এ চেষ্টা করবো যে, যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে এমন কোনো কিছু না ঘটে যাতে করে আমাদের মধ্যকার সুসম্পর্কটুকু নষ্ট না হয়ে যায়। এমনকি কারোর সঙ্গে তার প্রতিবেশীর ঝগড়া হলে তা অতি সত্বর মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এভাবে বাকি জীবনটুকু পরিচালনা করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

[77] সিয়ারু আলামিন-নুবালা: ১৪/৫৫৪।

উক্ত বইটিতে দলীলসহ ইসলামের পাঁচটি ও ঈমানের ছয়টি রুকন, ইসলাম বা ঈমান বিধ্বংসী দশটি বিষয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর অর্থ, রুকন ও শর্তসমূহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর অর্থ, রুকন ও শর্তসমূহ, বিশুদ্ধ, অযু ও গোসল সংক্রান্ত যাবতীয় মাসআলা এবং ফরয সালাত আদায়ের বিশুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।